শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ছোটদের
পল্লীসমাজ

ছেলেমেয়েদের জন্য
সংক্ষেপিত সংস্করণ

সংক্ষিপ্তকার
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য (প্রাইভেট) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো : কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৭২

প্রকাশক
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট্ লিমিটেড্
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীকানাই পাল

জীবন-কথা

শরৎচন্দ্র ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় কথাশিল্পী। তাঁর জীবন যেমন রোমাঞ্চকর, তাঁর রচনাও তেমনি অভিনব। সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি যে বহু অভিজ্ঞতার ফলেই সম্ভব, এই সত্যটি শরৎচন্দ্রের জীবনে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভাবে, ভাষায়, ঘটনা-বিন্যাসে ও চরিত্র-চিত্রণে—সর্বোপরি প্রকাশ-মাধুর্যে শরৎচন্দ্র বাংলার কথা-সাহিত্যকে নবরূপে, নব সুষমায় বিভূষিত করেছেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে বিষয়টি সকলের আগে লক্ষ্য করার, তা হচ্ছে তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব। যাকে কথায় বলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাওয়া, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলা যায়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় তাঁর 'বড়দিদি' নামক উপন্যাসখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে হইচই পড়ে যায়। সকলেরই ধারণা হয় যে, এমন সুন্দর লেখা রবীন্দ্রনাথের না হয়ে যায় না—রবীন্দ্রনাথই তাঁর নাম গোপন করে লিখতে আরম্ভ করেছেন। প্রথম দুটি সংখ্যাতে লেখকের নাম প্রকাশিত না হওয়াতেই এই গোলমাল সৃষ্টি হয়েছিল। পরে যখন এই লেখার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হ'ল, তখন সকলেই জানতে পারলেন যে শরৎচন্দ্র কত বড় লেখক।

কিন্তু মজা হ'ল এই যে, শরৎচন্দ্র তখন ছিলেন রেঙ্গুনে। এই রেঙ্গুনে যাবার সময় (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি তাঁর কতকগুলি লেখা তাঁর সম্পর্কীয় মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন, এবং নানা কারণে সেগুলি শরৎচন্দ্রের বিনা-অনুমতিতেই প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটি জানবার বিষয় হচ্ছে, তাঁর পারিবারিক দুরবস্থার কথা। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে মামারবাড়িতে

৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৭৬) শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থা কোন দিনই সচ্ছল ছিল না। এ জন্য শরৎচন্দ্রের বাল্যকাল অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। শৈশবে থেকেই তিনি ছিলেন যেমন চঞ্চল, তেমনি উদ্দাম প্রকৃতির। গ্রামের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়তে গিয়ে তিনি যে কত রকমের দুষ্টুমিই করতেন তার ইয়ত্তা নেই। স্কুলে ভর্তি হয়েও তাঁর এ স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ১৮৯২ সালে তাঁর বয়স যখন ষোল বৎসর, সেই সময় হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে তিনি ওঠেন, কিন্তু তখন মতিলালের আর্থিক অবস্থা এমনই সঙ্কটাপন্ন হয় যে, পরিবারবর্গকে তিনি ভাগলপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতে বাধ্য হন।

ভাগলপুরে থাকার ব্যবস্থা হওয়ার পর শরৎচন্দ্র স্থানীয় টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি উক্ত কলেজে এফ. এ. (বর্তমান কালের আই. এ.) পড়েন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। অতএব শরৎচন্দ্রের ছাত্রাবস্থার ইতিহাস এখানেই সমাপ্ত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রাবস্থা সমাপ্ত হলেও, পাঠের প্রতি শরৎচন্দ্রের চিরদিনই বিশেষ অনুরাগ ছিল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের নানা গ্রন্থ তিনি পাঠ করতেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ ঘটে ষোল বৎসর বয়সের মধ্যেই। কিন্তু সে প্রতিভা যে কতবড় তা তাঁর ঐ বয়সের মধ্যে রচিত 'কাশীনাথ' গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়। এই গল্পটি তাঁর দেবানন্দপুরের বন্ধুবান্ধবরা পড়ে চমৎকৃত হলেও, ঠিক ঠিক এর অসাধারণত্ব তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। কিন্তু সত্যকার প্রতিভা কখনো চাপা থাকে না। ক্রমশঃ এই সত্য আশপাশের সকলের মধ্যেই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো যে, শরৎচন্দ্র এক অসাধারণ সাহিত্য-

প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। অন্য ব্যাপারে শরৎচন্দ্র যত উদ্দাম ও চঞ্চল প্রকৃতির মানুষই হোন না কেন, সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। একান্ত নিভৃতে, একান্ত গোপনে তাঁর যে সাহিত্য-সাধনা চলতো, তার কথা বাইরে তিনি প্রকাশ করতে চাইতেন না; যদি কোন ফাঁকে এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়তো, তাহলে তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন।

কিন্তু প্রতিভা তো রাস্তার ধুলো-মাটি নয়, তার যে নিজস্ব সৌরভ আছে—নিজস্ব শক্তি আছে। কাজে-কাজেই শরৎচন্দ্রের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়তে খুব বেশী সময় লাগলো না। তবে শরৎচন্দ্রের এই সময়কার রচনাগুলি তাঁর 'বাগান' নামাঙ্কিত তিন খণ্ড পাণ্ডুলিপির আকারেই বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল—সাধারণ বাঙালী পাঠকদের তখন তা পড়বার সুযোগ হয়নি। সে সুযোগ তাঁদের হ'ল, যখন 'বড়দিদি' প্রকাশিত হ'ল। এই 'বড়দিদি'কে উপলক্ষ্য করেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি এমনই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, তাঁর রচনার জন্য পত্রিকা-সম্পাদকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কিন্তু তিনি তখন সুদূর ব্রহ্মদেশে। সাংসারিক দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য শরৎচন্দ্র সাতাশ বৎসর বয়সে বাঙলা দেশ ত্যাগ করে ব্রহ্মদেশে চাকরি করতে যান এবং এই অবকাশেই তাঁর পূর্বলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে।

এই সময়টিকে সাধারণতঃ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের আদি যুগ বা নেপথ্য-যুগও বলা যায়। বিদেশে গিয়ে গোড়ার কয়েক বৎসর শরৎচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির কাজে আর তেমনভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন নি, কারণ নানা বিষয়ের অধ্যয়নেই তাঁর অবসরকাল অতিবাহিত হ'ত। তাছাড়া স্বভাবতই তিনি ছিলেন অত্যন্ত অশান্ত প্রকৃতির। এই কারণে, চাকরি করার মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে এমন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন যে, কেউ তাঁর কোন খোঁজ-খবরই পেত না।

ইংরেজী ১৯১২ সালে তিন মাসের ছুটি নিয়ে, শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় আসেন, সেই সময় কলকাতার সাহিত্যিক-গোষ্ঠী, বিশেষ ভাবে 'যমুনা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়; তাতে নূতন করে তিনি আবার সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্যভাবে সাহিত্যিক-জীবনের সূত্রপাত বলা যায়। শরৎচন্দ্র নিজেও এই সময়কে অর্থাৎ ১৯১৩ সালকে তাঁর সত্যকার সাহিত্যিক-জীবনের সূত্রপাত হিসাবে গণ্য করে গিয়েছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ—সকল প্রকার রচনাতেই শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হতে থাকে এই সময় থেকে। বিশেষ করে, গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর লেখনী এমনভাবে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করেছিল, যাতে বেশী দিন আর তাঁর পক্ষে বিদেশে থাকা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯১৬ সালে তিনি বাঙলা দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। বাঙলার পাঠকসমাজ তাঁদের প্রিয় লেখককে নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়ে এক নূতন সাহিত্য-প্রেরণা ও সমাজ-চেতনা লাভ করেন।

শরৎচন্দ্রের এই আকস্মিক বিরাট জনপ্রিয়তা প্রকৃতই এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। তাঁর এই সার্বজনীন জনপ্রিয়তার বিষয় উপলব্ধি করেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, "অন্য লেখকরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সার্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি।"

সাহিত্যের আসল অর্থ নিয়ে যত মতভেদই থাকুক না কেন, কোন জাতির সাহিত্য যে তার মর্মবাণীর দ্যোতক, এ নিয়ে মতভেদের অবকাশ নেই। এই জিনিসটি যাঁর লেখনীতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তাঁর সৃষ্টি সামান্য নয়—এক অভিনব অসামান্যতায় তার দ্যুতি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, দীন-দরিদ্রের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা, সমাজ-জীবনের অসংখ্য দোষ-ত্রুটির

বিরুদ্ধে নির্ভীক মনোভাব—সর্বোপরি শিল্পীর অপরিসীম জীবনবোধ ও রসানুভূতি শরৎচন্দ্রকে এমনই একজন দরদী লেখক হবার সুযোগ এনে দিয়েছিল, যা তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে আর কারু ভাগ্যে ঘটেনি। বাঙালীর হৃদয়রাজ্যে যে-রহস্য লুকিয়েছিল, শরৎচন্দ্র তাকেই সাহিত্যে রূপ দিয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন জয় করেছিলেন। সাহিত্যকে কখনও তিনি তাঁর বিলাসের সামগ্রী মনে করেন নি—সমাজের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে, একাত্ম হয়ে, তিনি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। দেশের জনসাধারণের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর প্রীতি। ধর্ম, সমাজ, আচার, সংস্কার কোন কিছুই তাঁর এই দরদী উদার মনকে কক্ষচ্যুত করতে পারেনি।

উপন্যাস, নাটক, গল্প-গ্রন্থ, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অনেক বই তিনি লিখেছেন, তাঁর বই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে, তাঁর গল্পের ছবি হয়েছে সিনেমায়। পৃথিবীর নানা ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে, আর তার জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধেও লেখা হয়েছে অনেক অনেক বই।

কিন্তু একদিন সকল মানুষের মতই এই মহাজীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। মাত্র বাষট্টি বৎসর বয়সে, ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮) সকাল দশটার সময় কলিকাতার পার্ক নার্সিং হোম-এ শরৎচন্দ্রের জীবনের অবসান হয়—এই মরলোক থেকে তিনি বিদায় নেন।

এক

বেণী ঘোষাল মুখুজ্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিল, এই যে মাসি, রমা কই গা ?

মাসি আহ্নিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রন্ধনশালার চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, তা হ'লে রমা কি করবে স্থির করলে ?

জ্বলন্ত উনান হইতে শব্দায়মান কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিল, কিসের বড়দা ?

বেণী কহিল, তারিণী খুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন ! রমেশ তো কাল এসে হাজির হয়েছে। বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করেই করবে বলে বোধ হচ্ছে—যাবে নাকি ?

রমা দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ি ?

বেণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, সে তো জানি দিদি। আর যেই যাক্, তোরা কিছুতেই সেখানে যাবি নে।

পূজানিরতা মাসি আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া কহিলেন, আমি কিছুই ভুলিনি বেণীমাধব ! তারিণী তার এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখনও তো আর আমার যতীন জন্মায় নি—ভেবেছিল, যদু মুখুজ্যের সমস্ত বিষয়টা তা হ'লে মুঠোর মধ্যে আসবে--বুঝলে না বাবা বেণী ? তা যখন হ'ল না, তখন ঐ ভৈরব আচায্যিকে দিয়ে কি সব জপ-তপ তুক্-তাক্ করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমন আগুন ধরিয়ে দিলে যে ছ'মাস পেরুল না, বাছার হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল ! ছোট-জাত হয়ে চায় কিনা যদু মুখুজ্যের মেয়েকে বৌ করতে। বেণীর মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল, কারণ তারিণী ঘোষাল তাহারই খুড়া।

রমা ইহা লক্ষ্য করিয়া মাসিকে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিল, কেন মাসি, তুমি মানুষের জাত নিয়ে কথা কও? জাত তো আর কারুর হাতে গড়া জিনিস নয়? যে যেখানে জন্মেছে সেই তার ভাল।

বেণী লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, না রমা, মাসি ঠিক কথাই বলেছেন। তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন! ছোটখুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেয়াদপি। আর তুক্-তাকের কথা যদি বল তো সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোটখুড়ো আর ঐ ব্যাটা ভৈরব আচায্যির অসাধ্য কাজ কিছু নেই। ঐ ভৈরব তো হয়েচে আজকাল রমেশের মুরুব্বি।

রমা কহিল, বড়দা, বাবা বলতেন, আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিস্ নে মা। তারিণী ঘোষাল জ্যান্তে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি—বাবাকে পর্যন্ত জেল দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা, যতদিন বেঁচে থাকব' ভুলব না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে তো! তাছাড়া আমার তো কিছুতেই যাবার জো নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইবোনকে বিষয় ভাগ ক'রে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় রক্ষা করার ভার শুধু আমারই উপর যে! আমরা তো নয়-ই, আমাদের সংশ্রবে যারা আছে তাদের পর্যন্ত যেতে দেব না। একটু ভাবিয়া কহিল, আচ্ছা বড়দা, এমন করতে পার না যে, কোনও ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ি যায়?

বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, সেই চেষ্টাই তো করছি বোন! তুই আমার সহায় থাকিস্, আর আমি কোনও চিন্তে করি নে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি তো আমার নাম বেণী ঘোষাল নয়। বিষয়-সম্পত্তি কি ক'রে রক্ষে করতে হয়, এখনও সে শেখেনি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নির্মূল করতে পারা যায় তো ভবিষ্যতে আর যাবে না, এই কথাটা আমাদের দিবারাত্রি মনে রাখতে হবে যে, এ তারিণী ঘোষালের ছেলে—আর কেউ নয়।

সে আমি বুঝি বড়দা।

প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত হইতে অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠের আহ্বান আসিল—রাণী কই রে?

রমেশের মা এই নামে ছেলেবেলায় তাহাকে ডাকিতেন। পরক্ষণেই রুক্ষ মাথা, খালি পা, উত্তরীয়টা মাথায় জড়ানো—রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল। পলাইবার উপায় নাই, রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রমেশ মুহূর্তমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই যে! আরে ইস্, কত বড় হয়েছিস্ রে? ভাল আছিস্?

রমা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু রমেশ একটুখানি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, চিনতে পারছিস্ তো রে? আমি তোদের রমেশদা!

এখনও রমা মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। কিন্তু মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি ভাল আছেন?

হাঁ ভাই, ভাল আছি। কিন্তু আমাকে আপনি কেন রমা? বেণীর দিকে চাহিয়া একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, রমার সেই কথাটা আমি কোন দিন ভুলতে পারিনি বড়দা। যখন মা মারা গেলেন ও তখন তো খুব ছোট! সেই বয়সেই আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, রমেশদা, তুমি কেঁদ না, আমার মাকে আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব।—তোর সে কথা বোধ করি মনে পড়ে না রমা, না? আচ্ছা, আমার মাকে মনে পড়ে তো?

কথাটা শুনিয়া রমার ঘাড় যেন লজ্জায় আরও ঝুঁকিয়া পড়িল, সে একটিবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে পারিল না যে খুড়িমাকে তাহার মনে পড়ে! রমেশ বিশেষ করিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতে লাগিল, আর তো সময় নেই, মাঝে শুধু তিনটি দিন বাকি, যা করবার করে দাও ভাই, যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয়, আমি

তাই নীচু হয়েই তোমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্যন্তও করতে পারছি না।

মাসি আসিয়া নিঃশব্দে রমেশের পিছনে দাঁড়াইলেন। বেণী অথবা রমা কেহই যখন একটা কথারও জবাব দিল না, তখন তিনি সুমুখের দিকে সরিয়া আসিয়া রমেশের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি বাপু তারিণী ঘোষালের ছেলে না?

রমেশ এই মাসিটিকে ইতিপূর্বে দেখে নাই; কারণ সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পরে ইনি রমার জননীর অসুখের উপলক্ষে সেই যে মুখুজ্যেবাড়ি ঢুকিয়াছিলেন, আর বাহির হন নাই। রমেশ কিছু বিস্মিত হইয়াই তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মাসি বলিলেন, না হ'লে এমন বেহায়া পুরুষমানুষ আর কে হবে? যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা! বলা নেই, কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ির ভিতর ঢুকে উৎপাত করতে লজ্জা হয় না তোমার?

রমেশ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আমি চললুম, বলিয়া বেণী ব্যস্ত হইয়া সরিয়া পড়িল। রমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, কি বকচ মাসি, তুমি নিজের কাজে যাও না—

মাসি রমেশের নির্বাক ও অত্যন্ত পাংশুবর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরায় বলিলেন, যাই হোক, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর-দরওয়ান দিয়ে অপমান করাতে চাই নে—একটু হুঁশ করে কাজ ক'রো বাপু—যাও। কচি খোকাটি নও যে, ভদ্দরলোকের বাড়ির ভেতর ঢুকে আবদার করে বেড়াবে। তোমার বাড়িতে আমার রমা কখনো পা ধুতেও যেতে পারবে না, এই তোমাকে আমি ব'লে দিলুম!

হঠাৎ রমেশ যেন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার বিস্তৃত বক্ষের ভিতর হইতে এমনি গভীর একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, সে নিজেও সেই শব্দে সচকিত হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর কবাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রমা মুখ

তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। রমেশ একবার বোধ করি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে রান্নাঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, যখন যাওয়া হতেই পারে না তখন আর উপায় কি! কিন্তু আমি তো এত কথা জানতাম না—না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম, সে জন্য আমাকে মাপ ক'রো রাণী! বলিয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

দুই

এই কুঁয়াপুরের বিষয়টা পাওয়ার একটু ইতিহাস আছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে মহাকুলীন বলরাম মুখুজ্যে তাঁহার মিতা বলরাম ঘোষালকে সঙ্গে করিয়া বিক্রমপুর হইতে এদেশে আসেন। মুখুজ্যে শুধু কুলীন ছিলেন না, বুদ্ধিমানও ছিলেন। বিবাহ করিয়া, বর্ধমান রাজ-সরকারে চাকরি করিয়া এবং আরও কি কি করিয়া এই বিষয়টুকু হস্তগত করেন। ঘোষালও এই দিকেই বিবাহ করেন। কিন্তু পিতার ঋণ শোধ করা ভিন্ন আর তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাই দুঃখ-কষ্টেই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এই বিবাহ উপলক্ষেই নাকি দুই মিতার মনোমালিন্য ঘটে। পরিশেষে তাহা এমন বিবাদে পরিণত হয় যে, এক গ্রামে বাস করিয়াও বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ কাহারও মুখ-দর্শন করেন নাই। বলরাম মুখুজ্যে যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও ঘোষাল তাঁহার বাটীতে পা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার মরণের পরদিন অতি আশ্চর্য কথা শুনা গেল। তিনি নিজের সমস্ত বিষয় চুল-চিরিয়া অর্ধেক ভাগ করিয়া নিজের পুত্র ও মিতার পুত্রগণকে দিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি এই কুঁয়াপুরের বিষয় মুখুজ্যে ও ঘোষাল-বংশ ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছে। ইঁহারা নিজেরাও জমিদার বলিয়া অভিমান করিতেন, গ্রামের লোকও অস্বীকার করিত না। যখনকার কথা

বলিতেছি তখন ঘোষাল-বংশও ভাগ হইয়াছিল। সেই বংশের ছোট তরফের তারিণী ঘোষাল মকদ্দমা উপলক্ষে জেলায় গিয়া দিন-ছয়েক পূর্বে হঠাৎ যেদিন আদালতের ছোট-বড় পাঁচ-সাতটা মুলতুবি মকদ্দমার শেষ ফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কোথাকার কোন্ অজানা আদালতের মহামান্য সমন মাথায় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন, তখন তাঁহাদের কুঁয়াপুর গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বড় তরফের কর্তা বেণী ঘোষাল খুড়ার মৃত্যুতে গোপনে আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল এবং আরও গোপনে দল পাকাইতে লাগিল, কি করিয়া খুড়োর আগামী শ্রাদ্ধের দিনটা পণ্ড করিয়া দিবে। দশ বৎসর খুড়ো-ভাইপোর মুখ-দেখাদেখি ছিল না। বহু বৎসর তারিণীর গৃহ শূন্য হইয়াছিল। সেই অবধি পুত্র রমেশকে তাহার মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া তারিণী বাটীর ভিতরে দাস-দাসী এবং বাহিরে মকদ্দমা লইয়াই কাল কাটাইতেছিলেন। রমেশ রুড়কি কলেজে এই দুঃসংবাদ পাইয়া পিতার শেষ কর্তব্য সম্পন্ন করিতে সুদীর্ঘ-কাল পরে কাল অপরাহ্নে তাহার শূন্যগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কর্মবাড়ি। মধ্যে শুধু দুটো দিন বাকি। বৃহস্পতিবার রমেশের পিতার শ্রাদ্ধ। দুই-একজন করিয়া ভিন্ন গ্রামের মুরুব্বিরা উপস্থিত হইতেছেন; কিন্তু নিজেদের কুঁয়াপুরের কেন যে কেহ আসে না, রমেশ তাহা বুঝিয়াছিল এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত কেহ আসিবেই না, তাহাও জানিত। শুধু ভৈরব আচার্য ও তাহার বাড়ির লোকেরা আসিয়া কাজকর্মে যোগ দিয়াছিল। স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির আশা না থাকিলেও উদ্যোগ-আয়োজন রমেশ বড়লোকের মতই করিয়াছিল। আজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বাড়ির ভিতরে কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিল। কি জন্যে বাহিরে আসিতেই দেখিল ইতিমধ্যে জন-দুই প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়া বৈঠকখানার বিছানায় সমাগত হইয়া ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া

সবিনয়ে কিছু বলিবার পূর্বেই পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক অতি বৃদ্ধ পাঁচ-ছয়টি ছেলেমেয়ে লইয়া কাসিতে কাসিতে বাড়ি ঢুকিলেন ; তাঁহার কাঁধে মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর একজোড়া ভাঁটার মত মস্ত চশমা—পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। শাদা চুল, শাদা গোঁফ—তামাকের ধোঁয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া আসিয়া তিনি সেই ভীষণ চশমার ভিতর দিয়া রমেশের মুখের দিকে মুহূর্তকাল চাহিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেশ চিনিল না ইনি কে, কিন্তু যেই হোন ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিতেই তিনি ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিলেন, না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন করে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি, কিন্তু আমারও এমন চাটুজ্যে বংশে জন্ম নয় যে, কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরুবে। আসবার সময় তোমার বেণী ঘোষালের মুখের সামনেই ব'লে এলুম, আমাদের রমেশ যেমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করছে, এমন করা চুলোয় যাক, এ অঞ্চলে কেউ কখনো চোখেও দেখেনি।

ধর্মদাস নিতান্ত অত্যুক্তি করেন নাই। উদ্যোগ-আয়োজন যেরূপ হইতেছিল, এদিকে সেরূপ কেহ করে নাই। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল। তাহারা প্রাঙ্গণের একধারে ভিয়ান চড়াইয়াছে—সেদিকে পাড়ার কতকগুলো ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, কাঙালীদের বস্ত্র দেওয়া হইবে—চণ্ডীমণ্ডপের ওধারের বারান্দায় অনুগত ভৈরব আচার্য থান ফাঁড়িয়া পাট করিয়া গাদা করিতেছিল—সেদিকে জনকয়েক লোক থাবা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া মনে মনে রমেশের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। গরীব-দুঃখী সংবাদ পাইয়া অনেক দূরের পথ হইতেও আসিয়া জুটিতেছিল। লোকজন, প্রজা-পাঠক বাড়ি পরিপূর্ণ করিয়া কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ বা মিছামিছি শুধু কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া ব্যয়-বাহুল্য দেখিয়া ধর্মদাসের কাসি আরও বাড়িয়া গেল।

প্রত্যুত্তরে রমেশ সংকুচিত হইয়া না-না বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ধর্মদাস হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ঘড়ঘড় করিয়া কত কি বলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু কাসির ধমকে তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী সর্বাগ্রে আসিয়াছিলেন। ধর্মদাসকে উদ্দেশ করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, কাল সকালে, বুঝলে ধর্মদাস'দা, এখানে আসব বলে বেরিয়েও আসা হ'ল না—বেণীর ডাকাডাকি—গোবিন্দখুড়ো, তামাক খেয়ে যাও। একবার ভাবলুম কাজ নেই--তারপর মনে হ'ল ভাবখানা বেণীর দেখেই যাই না। বেণী কি বললে জানো বাবা রমেশ! বললে, খুড়ো, বলি তোমর তো বমেশেব মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েছ, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, লোকজন খাবে-টাবে তো? আমিই বা ছাড়ি কেন? তুমি বড়লোক আছ না আছ, আমার বমেশ কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘরে তো এক-মুঠো চিঁড়ের পিত্যেশ কারু নেই। বললুম, বেণীবাবু, এই তো পথ, একবার কাঙালী-বিদেয়টা দাঁড়িয়ে দেখো। কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকেব পাটা তো বলি একে!—এতটা বয়স হ'ল, এমন আয়োজন কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু তাও বলি ধর্মদাস'দা, আমাদের সাধ্যিই বা কি! যাঁব কাজ তিনিই উপর থেকে করাচ্ছেন। তারিণী'দা শাপভ্রষ্ট দিক্‌পাল ছিলেন বই তো নয়!

ধর্মদাসের কিছুতেই কাসি থামে না, তিনি কাসিতেই লাগিলেন, আব তাঁহার মুখেব সামনে গাঙ্গুলীমশাই বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া ধর্মদাস আরও ভাল কিছু বলিবার চেষ্টায় যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিলেন।

গাঙ্গুলী বলিতে লাগিলেন, তুমি তো আমার পর নও বাবা—নিতান্ত আপনার। তোমার মা যে আমার একেবারে সাক্ষাৎ

পিসতুতো বোনের খুড়তুতো ভগিনী। রাধানগরের বাঁড়ুজ্যে-বাড়ি—সে সব তারিণী'দা জানতেন। তাই যে-কোন কাজ-কর্ম, মামলা-মকদ্দমা করতে, সাক্ষী দিতে—ডাক গোবিন্দকে!

কই গো, বাবাজী কোথায় গো? বলিয়া একটি শীর্ণকায় মুণ্ডিত-শ্মশ্রু প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন। ইহার সঙ্গেও গুটি-তিনেক ছেলেমেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়। তাহার পরণে শুধু একখানি অতি জীর্ণ ডুরে-কাপড়। বালক দুটি কোমরে এক-একগাছি ঘুন্‌সি ব্যতীত একেবারে দিগম্বর। উপস্থিত সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। গোবিন্দ অভ্যর্থনা করিল, এস দীনু'দা, ব'সো। বড় ভাগ্যি আমাদের যে তোমাব পায়ের ধুলো পড়ল। ছেলেটা একা সারা হয়ে যায়, তা তোমরা—

ধর্মদাস গোবিন্দের প্রতি কট্‌মট্ করিয়া চাহিলেন। তিনি ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না করিয়া কহিলেন, তা তোমরা তো কেউ এদিকে মাড়াবে না দাদা; বলিয়া তাঁহার হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিলেন। দীনু ভট্‌চায্ আসন গ্রহণ করিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় নিরর্থক গোটা-দুই টান দিয়া বলিলেন, আমি তো ছিলাম না ভায়া—তোমার বৌঠাকরুণকে আনতে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম। বাবাজী কোথায়? শুনছি নাকি ভারী আয়োজন হচ্ছে? পথে আসতে ও-গাঁয়ের হাটে শুনে এলুম খাইয়ে-দাইয়ে ছেলে-বুড়োর হাতে ষোলখানা ক'রে লুচি আর চার-জোড়া ক'রে সন্দেশ দেওয়া হবে।

গোবিন্দ গলা খাটো করিয়া কহিলেন, তাছাড়া হয়ত একখানা ক'রে কাপড়ও। এই যে রমেশ বাবাজী, তাই দীনু'দাকে বলছিলাম বাবাজী—তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে যোগাড়-সোগাড় একরকম করা তো যাচ্ছে, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে। এই আমার কাছেই দু'বার লোক পাঠিয়েছে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার যেন নাড়ির টান্ রয়েছে; কিন্তু এই যে দীনু'দা, ধর্মদাস'দা, এঁরাই কি বাবা তোমাকে

ফেলতে পারবেন? দীনু'দা তো পথ থেকে শুনতে পেয়ে ছুটে আসছেন। ওরে ও ষষ্ঠীচরণ, তামাক দে না রে।

উলঙ্গ শিশু দুটি ছুটিয়া আসিয়া দিনুদা'র কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল,—বাবা, সন্দেশ খাব।

দীনু একবার রমেশের প্রতি, একবার গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, সন্দেশ কোথায় পাব রে?

কেন, ঐ যে হচ্ছে, বলিয়া তাহারা ওদিকের ময়রাদের দেখাইয়া দিল।

আমরাও দাদামশাই, বলিয়া নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আরও তিন-চারিটি ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ধর্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল।

বেশ তো, বেশ তো, বলিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল,—ও আচায্যিমশাই, বিকেলবেলায় ছেলেরা সব বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, খেয়ে তো আসেনি—ওহে ও, কি নাম তোমার? নিয়ে এসো তো ঐ থালাটা এদিকে।

ময়রা সন্দেশের থালা লইয়া আসিবামাত্র ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল, বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুষ্কদৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল—ওরে ও খেঁদি, খাচ্ছিস্ তো, সন্দেশ হয়েছে কেমন বল্ দেখি?

বেশ বাবা, বলিয়া খেঁদি চিবাইতে লাগিল।

দীনু মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তাদের আবার পছন্দ? মিষ্টি হলেই হ'ল। হাঁ হে কারিগর, এ কড়াটা কেমন নামালে? কি বল গোবিন্দ-ভায়া, এখনও একটু রোদ আছে বলে মনে হচ্ছে না?

ময়রা কোন দিকে না চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে আছে বইকি! এখানো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যে-আহ্নিকের—

তবে কই দাও দেখি একটা গোবিন্দ-ভায়াকে, চেখে দেখুক কেমন

কলকাতার কারিগর তোমরা! না, না, আমাকে আবার কেন? তবে আধখানা—আধখানার বেশি নয়। ওরে ষষ্ঠীচরণ, একটু জল আন দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি—

রমেশ ডাকিয়া বলিয়া দিল, অমনি বাড়ির ভেতর থেকে গোটা-চারেক থালাও নিয়ে আসিস্ ষষ্ঠিচরণ।

প্রভুর আদেশমত ভিতর হইতে গোটা-তিনেক রেকাব ও জলের গেলাস আসিল এবং দেখিতে দেখিতে এই বৃহৎ থালার অর্ধেক মিষ্টান্ন এই তিন প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট সদ্‌ব্রাহ্মণের জলযোগে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

হাঁ, ওস্তাদী হাত বটে! বলিয়া গোবিন্দ সকলের শেষ হাত ধুইবার উপক্রম করিতেই ময়রা সবিনয়ে অনুরোধ করিল, যদি কষ্টই করলেন ঠাকুরমশাই, তবে মিহিদানাটাও একটু পরখ করে নিন।

মিহিদানা? কই, আনো দেখি বাপু।

মিহিদানা আসিল এবং এতগুলি সন্দেশের পরে এই নূতন বস্তুটির সদ্ব্যবহার দেখিয়া রমেশ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। দীননাথ কহিলেন, হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে! যেন অমৃত! তা বেশ হয়েছে। মিষ্টি বুঝি দু'রকম করালে বাবাজী?

রমেশকে বলিতে হইল না। ময়রা সোৎসাহে কহিল, আজ্ঞে না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন—

অ্যাঁ ক্ষীরমোহন!—কই সে তো বার করলে না বাপু?

রমেশ হাসিয়া রাখালকে কহিল, ভেতরে বোধ করি আচায্যি-মশাই আছেন; যা তো রাখাল, কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আনতে ব'লে আয় দেখি।

সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তথাপি ব্রাহ্মণেরা ক্ষীর-মোহনের আশায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ আর ভাঁড়ারের চাবি খোলা হবে না বাবু। ও-বাড়ি থেকে গিন্নীমা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করেছেন যে!

ধর্মদাস এবং গোবিন্দ উভয়ে চমকিয়া উঠিলেন, কে, বড়গিন্নী ?

রমেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, জ্যাঠাইমা এসেছেন ?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি এসেই ছোট বড় দুই ভাঁড়াবই তালাবন্ধ ক'রে ফেলেছেন।

বিস্ময়ে আনন্দে রমেশ দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

তিন

জ্যাঠাইমা !

ডাক শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী ভাঁড়াব-ঘর হইতে বাহিবে আসিলেন। বেণীর বয়সেব সঙ্গে তুলনা কবিলে তাহার জননীর বয়স পঞ্চাশের কম হওযা উচিত নয়, কিন্তু দেখিলে কিছুতেই চল্লিশের বেশি মনে হয় না।

বমেশ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া বহিল।

এই জ্যাঠাইমা বমেশকে এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরলোক-গতা জননীকে এক সময় বড় ভালোবাসিতেন। পিতৃহীন রমেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা যেভাবে হাহাকাব করিয়া উঠিল তাহার লেশমাত্র তিনি বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না; বরং একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, চিনতে পারিস্ রমেশ ?

জবাব দিতে গিয়া রমেশের ঠোঁট কাঁপিয়া গেল। মা মারা গেলে যতদিন না সে মামার বাড় গিয়াছিল, ততদিন এই জ্যাঠাইমা তাহাকে বুকে করিয়া বাখিয়াছিলেন এবং কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন নাই। সে-ও মনে পড়িল এবং এ-ও মনে হইল, সেদিন ও-বাড়িতে গেলে জ্যাঠাইমা বাড়ি নাই বলিয়া দেখা পর্যন্ত করেন নাই। তার পর রমাদের বাড়িতে বেণীর সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে তাহার মাসির

নিরতিশয় কঠিন তিরস্কারে সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিয়াছিল, এ গ্রামে আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই। বিশ্বেশ্বরী রমেশের মুখের প্রতি মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ছি বাবা, এ সময়ে শক্ত হতে হয়।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে কোমলতার আভাসমাত্র যেন ছিল না। রমেশ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। সে বুঝিল, যেখানে অভিমানের কোন মর্যাদা নাই, সেখানে অভিমান প্রকাশ পাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কহিল, শক্ত আমি হয়েছি জ্যাঠাইমা। তাই, যা পারতুম নিজেই করতুম, কেন তুমি আবার এলে?

জ্যাঠাইমা হাসিলেন। কহিলেন, তুই তো আমাকে ডেকে আনিস্ নি রমেশ, যে তোকে তার কৈফিয়ত দেব? তা শোন্ বলি। কাজকর্ম হবার আগে আমি ভাঁড়ার থেকে খাবার-টাবার কোন জিনিস বার হতে দেব না, যাবার সময় ভাঁড়াবের চাবি তোর হাতেই দিয়ে যাব, আবার কাল এসে তোব হাত থেকেই নেব। আর কারু হাতে দিস্ নে যেন! হাঁ বে, সেদিন তোর বড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

প্রশ্ন শুনিয়া রমেশ দ্বিধায় পড়িল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, তিনি পুত্রেব ব্যবহার জানেন কিনা। একটু ভাবিয়া কহিল, বড়দা তখন তো বাড়ি ছিলেন না।

প্রশ্ন কবিয়াই জ্যাঠাইমার মুখেব উপব একটা উদ্বেগের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল; রমেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহাব এই কথায় সেই ভাবটা যেন কাটিয়া গিয়া মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হাসিমুখে সস্নেহ অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, আ আমার কপাল। এই বুঝি! হাঁ রে, দেখা হয়নি বলে আর যেতে নেই? আমি জানি রে, সে তোদের ওপর সন্তুষ্ট নয়; কিন্তু তোর কাজ তো তোকে করা চাই। যা, একবার ভাল করে বল্ গে যা রমেশ! সে বড় ভাই, তার কাছে হেঁট হতে তোর কোন লজ্জা নেই। তাছাড়া এটা মানুষের এমনি দুঃসময় বাবা, যে-কোন লোকের হাতে-পায়ে ধ'রে মিটমাট

করে নিতেও লজ্জা নেই। লক্ষ্মী-মাণিক আমার, যা একবার—এখন বোধ হয় সে বাড়িতেই আছে।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। এই আগ্রহাতিশয্যের হেতুও তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইল না, মন হইতে সংশয়ও ঘুচিল না। বিশ্বেশ্বরী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, বাইরে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের আমি তোর চেয়ে ঢের বেশি জানি। তাঁদের কথা শুনিস্ নে, আয়, আমার সঙ্গে তোর বড়দার কাছে একবার যাবি চল্।

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না জ্যাঠাইমা, সে হয় না। আর বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা যাই হোন, তাঁরাই আমার সকলের চেয়ে আপনার।

সে আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ জ্যাঠাইমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে মহা বিস্ময়ে চুপ করিল। তাহার মনে হইল জ্যাঠাইমার মুখখানি যেন সহসা চারিদিকের সন্ধ্যার চেয়েও বেশি মলিন হইয়া গেল। খানিক পরে তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তবে যাই। যখন তার কাছে যাওয়া হতেই পারবে না, তখন আর সে নিয়ে কথা কয়ে কি হবে। যা হোক, তুই কিছু ভাবিস নি বাবা, কিছুই আটকাবে না। আমি আবার খুব ভোরেই আসব। বলিয়া বিশ্বেশ্বরী তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। বেণীর সহিত রমেশের ইতিমধ্যে দেখা হইয়া যে একটা কিছু হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন। তিনি যে পথে গেলেন, সেই দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রমেশ ম্লানমুখে যখন বাহিরে আসিল, তখন গোবিন্দ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী, বড়গিন্নী এসেছিলেন না?

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

শুনলুম ভাঁড়ার বন্ধ ক'রে চাবি নিয়ে গেলেন, না?

রমেশ তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল। কারণ, অবশেষে কি মনে করিয়া তিনি যাইবার সময় ভাঁড়ারের চাবি নিজেই লইয়া

গিয়াছিলেন। গোবিন্দ কহিলেন, দেখলে ধর্মদাস'দা, যা বলেছি তাই।

সকলে চলিয়া গেলে রমেশ জ্যাঠাইমার সস্নেহ অনুরোধ এবং তাঁহার ব্যথিত মুখ মনে করিয়া বড়দা'র কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন রাত্রি আটটা। ভিতরে যেন একটা লড়াই চলিতেছে। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাঁকাহাঁকিটাই সবচেয়ে বেশি। বাহির হইতেই তাহার কানে গেল, গোবিন্দ বাজি রাখিয়া বলিতেছেন, এ যদি না দু'দিনে উচ্ছন্ন যায় তো আমার গোবিন্দ গাঙ্গুলী নাম তোমরা বদলে রেখো বেণীবাবু! নবাবী কাণ্ডকারখানা শুনলে তো? তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি তা জানি, তবে এত কেন? হাতে থাকে কর্, না থাকে বিষয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা ক'রে বাপের ছাদ্দ করে, তা তো কখনো শুনিনি বাবা! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি বেণীমাধববাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদি থেকে অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা দেনা করেছে।

বেণী উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, তা হ'লে কথাটা তো বার করে নিতে হচ্ছে গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ স্বর মৃদু করিয়া বলিলেন, সবুর কর না বাবাজী! এক-বার ভাল ক'রে ঢুকতেই দাও না—তার পরে—বাইরে দাঁড়িয়ে কে ও? এ কি রমেশ বাবাজী? আমরা থাকতে এত রাত্তিরে তুমি কেন বাবা?

রমেশ সে কথার জবাব না দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, বড়দা, আপনার কাছেই এলুম।

বেণী থতমত খাইয়া জবাব দিতে পারিলেন না। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ কহিলেন, আসবে বই কি বাবা, একশবার আসবে। এ তো তোমারই বাড়ি! আর বড়ভাই পিতৃতুল্য। তাই তো আমরা বেণীবাবুকে বলতে এসেছি, বেণীবাবু, তারিণী'দার সঙ্গে মনোমালিন্য তাঁর সঙ্গেই যাক—আর কেন? তোমরা দু'ভাই

এক হও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই—কি বল হালদারমামা ?—ও কি দাঁড়িয়ে রইলে যে বাবা—কে আছিস্ রে, একখানা কম্বলের আসন-টাসন পেতে দে না রে! না বেণীবাবু, তুমি বড় ভাই—তুমিই সব। তুমি আলাদা হয়ে থাকলে চলবে না। তাছাড়া বড়গিন্নী ঠাকরুণ যখন স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—

বেণী চমকাইয়া উঠিল—মা গিয়েছিলেন ?

এই চমকটা লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ মনে মনে খুসী হইলেন; কিন্তু বাইরে সে ভাব গোপন করিয়া নিতান্ত ভালোমানুষের মত খবরটা ফলাও করিয়া বলিতে লাগিলেন, শুধু যাওয়া কেন ভাঁড়ার-টাড়ার—করা-কর্ম যা কিছু তিনিই তো করছেন। আর তিনি না করলে করবেই বা কে ?

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ-বিনীত কণ্ঠে বলিল, বড়দা, একবার পায়ের ধুলো যদি দিতে পারেন –

বেণী গম্ভীর হইয়া বলিল, মা যখন গেছেন তখন আমার যাওয়া না-যাওয়া—কি বল গোবিন্দখুড়ো ?

গোবিন্দ কথা কহিবার পূবেই রমেশ বলিল, আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাই নে বড়দা, যদি অসুবিধা না হয় একবার দেখে-শুনে আসবেন।

বেণী চুপ কবিয়া রহিল। গোবিন্দ কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই রমেশ উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন গোবিন্দ বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, দেখলে বেণীবাবু, কথার ভাবখানা! বেণী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, কথা কহিল না।

পথে চলিতে চলিতে গোবিন্দর কথাগুলো মনে করিয়া রমেশের সমস্ত মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অর্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই আবার বেণী ঘোষালের বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে তখন তর্ক কোলাহল উদ্দাম হইয়া

উঠিয়াছিল ; কিন্তু সে শুনিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সোজা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমেশ ডাকিল, জ্যাঠাইমা !

জ্যাঠাইমা তাঁহার ঘরের সুমুখের বারান্দায় অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, এত রাত্রে রমেশের গলা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। —রমেশ ? কেন রে ?

রমেশ উঠিয়া আসিল ! জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, একটু দাঁড়া বাবা, একটা আলো আনতে ব'লে দি।

আলোয় কাজ নেই জ্যাঠাইমা, তুমি উঠো না। বলিয়া রমেশ অন্ধকারেই একপাশে বসিয়া পড়িল। তখন জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করিলেন এত রাত্তিরে যে ?

রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, এখনো তো নিমন্ত্রণ করা হয়নি জ্যাঠাইমা, তাই তোমাকে জিজ্ঞেসা করতে এলুম।

তবেই মুস্কিলে ফেল্‌লি বাবা ! এঁরা কি বলেন ? গোবিন্দ গাঙুলী, চাটুজ্যেমশাই—

রমেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, জানি নে জ্যাঠাইমা, কি এঁরা বলেন। জানতেও চাই নে—তুমি যা বলবে তাই হবে।

অকস্মাৎ রমেশের কথার উত্তাপে বিশ্বেশ্বরী মনে মনে বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু তখন যে বল্‌লি রমেশ, এঁরাই তোর সবচেয়ে আপনার ! তা যাই হোক, আমার মেয়ে-মানুষের কথায় কি হবে বাবা ? এ গাঁয়ে যে আবার—আর এ গাঁয়েই বা কেন বলি, সব গাঁয়েই—এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না—একটা কাজকর্ম প'ড়ে গেলে আর মানুষের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর গ্রামের মধ্যে নেই।

রমেশ বিশেষ আশ্চর্য হইল না। কারণ এই কয়দিনের মধ্যেই সে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ রকম হয় জ্যাঠাইমা ?

সে অনেক কথা বাবা। যদি থাকিস্ এখানে, আপনি সব জানতে পারবি।

রমেশ কহিল, কিন্তু আমার সঙ্গে তো তার কোন যোগ নেই। আমি একরকম বিদেশী বললেই হয়—কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। তাই আমি বলি জ্যাঠাইমা, আমি দলাদলির কোন বিচারই করব না, সমস্ত ব্রাহ্মণ-শূদ্রই নিমন্ত্রণ ক'রে আসব। কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া তো পারি নে; তুমি হুকুম দাও জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন, এ রকম হুকুম তো দিতে পারি নে রমেশ! তাতে ভাবী গোলযোগ ঘটবে। তবে তোর কথাও যে সত্যি নয়, তাও আমি বলে নে। কিন্তু এ ঠিক সত্যি-মিথ্যের কথা নয় বাবা। সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা ক'রে রেখেছে, তাকে জবরদস্তি ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক, তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভালো করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না—এ রকম হলে তো কোনমতেই চলতে পারে না রমেশ!

সে তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, এ গাঁয়ের সমাজ বলতে ধর্মদাস, গোবিন্দ—এঁরা তো? এমন সমাজের একবিন্দু ক্ষমতাও না থাকে, সেই তো ঢের ভাল জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা রমেশের উষ্ণতা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, শুধু এঁরা নয় রমেশ, তোমার বড়দা বেণীও সমাজের কর্তা।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরায় বলিলেন, তাই আমি বলি এঁদের মত নিয়ে কাজ করো গে রমেশ। সবেমাত্র বাড়িতে পা দিয়েই এঁদের বিরুদ্ধতা করা ভাল নয়।

কি করব জ্যাঠাইমা, আমি স্থির করেছি, আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করব।

তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখ অপ্রসন্ন হইল; বোধ

করি বা মনে মনে বিরক্তও হইলেন, বলিলেন, তা হ'লে আমার হুকুম নিতে আসাটা তোমার শুধু একটা ছলমাত্র।

জ্যাঠাইমার বিরক্তি রমেশ লক্ষ্য করিল, কিন্তু বিচলিত হইল না। খানিক পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমি জানতুম জ্যাঠাইমা, যা অন্যায় নয়, আমার সে কাজে তুমি প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্বাদ করবে। আমার—

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু এটাও তো তোমার জানা উচিত ছিল রমেশ, যে আমার সন্তানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না?

কথাটা রমেশকে আঘাত করিল। সে ক্ষণকাল মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাপা অভিমানের সুরে বলিল, কাল পর্যন্ত তাই জানতুম জ্যাঠাইমা! তাই তোমাকে তখন বলেছিলুম, যা পারি আমি একলা করি, তুমি এসো না, তোমাকে ডাকবার সাহসও আমার হয়নি।

এই ক্ষুণ্ণ অভিমান জ্যাঠাইমার অগোচর রহিল না। কিন্তু তিনি আর জবাব দিলেন না, অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে রমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বলিলেন, তবে একটু দাঁড়াও বাছা, তোমার ভাঁড়ার-ঘরের চাবিটা এনে দিই, বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে চাবি আনিয়া রমেশের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চাবিটা তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। ঘণ্টা-কয়েকমাত্র পূর্বে সে মনে মনে বলিয়াছিল, আর আমার ভয় কি, আমার জ্যাঠাইমা আছেন; কিন্তু একটা রাত্রিও কাটিল না, তাহাকে আবার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইল, না, আমার কেউ নেই—জ্যাঠাইমাও আমাকে ত্যাগ করেছেন।

চার

বাহিরে এইমাত্র শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আসন হইতে উঠিয়া রমেশ অভ্যাগতদের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—বাড়ির ভিতরে আহারের জন্য পাতা পাতিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একটা গোলযোগ হাঁকাহাঁকি শুনিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিল। ভিতরে রন্ধনশালাব কপাটের একপাশে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বিধবা মেয়ে জড়সড় হইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং আর একটি প্রৌঢ়া রমণী তাহাকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে চোখ-মুখ রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিতেছে। বিবাদ বাধিয়াছে পরাণ হালদারের সহিত। রমেশকে দেখিবামাত্র প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ বাবা, তুমিও তো গাঁয়ের একজন জমিদার, বলি, যত দোষ কি এই ক্ষেন্তি বাম্‌নির মেয়ের? মাথাব ওপর আমাদের কেউ নেই ব'লে কি যতবার খুসী শাস্তি দেবে?

রমেশ ব্যাপারটা কি, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। গোবিন্দ গাঙুলী বসিয়াছিলেন, মীমাংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গোলযোগ চরমে উঠিল। রমেশ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ-সাত-দশজন চাদর কাঁধে ফেলিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহারা পাড়াগাঁয়েরই লোক; সামাজিক ব্যাপারে কোথায় কোন্ চাল সর্বাপেক্ষা লাভজনক ইহা তাহাদের অবিদিত নহে।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা যাহার যা খুসী বলিতে লাগিল। ভৈরব এবং দীনু ভট্চায কাঁদ-কাঁদ হইয়া বার বার ক্ষ্যান্তমাসি ও তাহার মেয়ের, একবার গাঙুলি একবার হালদার মহাশয়ের হাতে-পায়ে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল—চারিদিক হইতে সমস্ত

অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্ম যেন লণ্ডভণ্ড হইবার সূচনা প্রকাশ করিল; কিন্তু রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না। একে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড। সে পাংশুমুখে কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রমেশ!

অকস্মাৎ এক মুহূর্তে সমস্ত লোকের সচকিত দৃষ্টি এক হইয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া কপাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মাথার উপর আঁচল ছিল, কিন্তু মুখখানি অনাবৃত। রমেশ দেখিল, জ্যাঠাইমা আপনিই কখন আসিয়াছেন—তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। বাহিরের লোক দেখিল ইনিই বিশ্বেশ্বরী, ইনিই ঘোষাল-বাড়ির গিন্নী-মা।

সুস্পষ্ট তীব্র আহ্বানে রমেশের বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। জ্যাঠাইমা আড়াল হইতে তেমনি সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, গাঙ্গুলীমশায়কে ভয় দেখাতে মানা ক'রে দে রমেশ। আর হালদারমশায়কে আমার নাম ক'রে বল্ যে, আমি সবাইকে আদর ক'রে বাড়ীতে ডেকে এনেছি—সুকুমারীকে অপমান করবার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজকর্মের বাড়ীতে হাঁকাহাঁকি, চেঁচামেচি, গালিগালাজ করতে আমি নিষেধ করছি। যাঁর অসুবিধে হবে তিনি আর কোথাও গিয়ে বসুন।

বড়গিন্নীর কড়া হুকুম সকলে নিজের কানে শুনিতে পাইল।

অতঃপর আর কোন গোলযোগ ঘটিল না। ব্রাহ্মণেরা যাহা ভোজন করিলেন, তাহা চোখে না দেখিলে প্রত্যয় করা শক্ত এবং প্রত্যেকেই খুদি, পটল, ন্যাড়া, বুড়ি প্রভৃতি বাটীর অনুপস্থিত বালক-বালিকার নাম করিয়া যাহা বাঁধিয়া লইলেন তাহাও যৎকিঞ্চিৎ নহে।

পাঁচ

এ-পাড়াব একমাত্র মধু পালের দোকান নদীর পথে হাটের একধারে। দশ-বাব দিন হইয়া গেল, অথচ সে বাকি দশ টাকা লইযা যায় নাই, বলিয়া রমেশ কি মনে কবিয়া নিজেই একদিন সকালবেলা দোকানেব উদ্দেশ্যে বাহিব হইয়া পড়িল। মধু পাল দয়া-সমাদর করিযা ছোটবাবুকে বাবান্দার উপব মোড়া পাতিয়া বসাইল এবং ছোটবাবুব আসিবাব হেতু শুনিয়া গভীব আশ্চর্যে অবাক্ হইয়া গেল। যে ধাবে, সে উপযাচক হইয়া ঘব বহিয়া ঋণ শোধ করিতে আসে তাহা মধু পাল এতটা বয়সে কখনও চোখে তো দেখেই নাই, কানেও শোনে নাই। কথায় কথায অনেক কথা হইল। মধু কহিল, দোকান কেমন কবে চলবে বাবু? ছু' আনা, চাব আনা, এক টাকা, পাঁচ সিকে ক'রে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা বাকি পড়ে গেছে। এই দিয়ে যাচ্চি ব'লে ছু'মাসেও আদায় হবাব জো নেই! এ কি বাঁড়ুজ্যেমশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃপেন্নাম হই।

বাঁড়ুজ্যেমশায়ের বাঁ হাতে একটা গাড়ু, পায়ের নখে গোড়ালিতে কাদার দাগ, কানে পৈতা জড়ানো, ডান হাতে কচুপাতায় মোড়া চারিটি কুচো-চিংড়ি। তিনি ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কাল রাত্তিবে এলুম, তামাক খা' দিকি মধু, বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের চিংড়ি ফেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, সৈরুবি জেলেনীর আক্কেল দেখলি মধু, খপ্ করে হাতটা আমার ধরে ফেললে? কালে কালে কি হ'ল বল্ দেখি রে,—এই কি এক পয়সার চিংড়ি? বামুনকে ঠকিয়ে ক'কাল খাবি তুই, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?

মধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, হাত ধরে ফেললে আপনার?

ক্রুদ্ধ বাঁড়ুজ্যেমশাই একবার চারিদেকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত

হইয়া কহিলেন, আড়াইটি পয়সা শুধু বাকি, তাই ব'লে খামকা হাটসুদ্ধ লোকের সামনে হাত ধরবে আমার ?

হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন কবিলেন, বাবুটি কে মধু ?

মধু সগর্বে কহিল, আমাদেব ছোটবাবুব ছেলে যে ! সেদিনেব দশ টাকা বাকি ছিল ব'লে নিজে বাড়ি ব'য়ে দিতে এসেছেন।

বাঁড়ুজ্যেমশায় কুচো-চিংড়িব অভিযোগ ভুলিয়া দুই চক্ষু বিস্ফাবিত কবিয়া কহিলেন, অ্যাঁ, বমেশ বাবাজী ? বেঁচে থাক বাবা। হাঁ, এসে শুনলুম একটা কাজেব মত কাজ কবেছ বটে ! এমন খাওয়া-দাওয়া এ অঞ্চলে কখন হয়নি ; কিন্তু বড় দুঃখ বইল চোখে দেখতে পেলুম না !

বমেশ ফিবিয়া আসিয়া বাড়ি ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে হাতের হুঁকাটা একপাশে বাখিয়া দিযা একেবারে পায়েব কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম কবিল। উঠিয়া কহিল, আমি বনমালী পাড়ুই—আপনাদের ইস্কুলেব হেড্‌মাষ্টাব। দু'দিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি ; তাই বলি—

রমেশ সমাদর কবিয়া পাড়ুই মহাশয়কে চেয়াবে বসাইতে গেল, কিন্তু সে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকের মধ্যে এই একটা অতি ছোট রকমেব ইস্কুল মুখুজ্যে ও ঘোষালদেব যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্র পড়ে।

হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া রমেশ একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাষ্টার-পণ্ডিত চারিজন এবং তাহাদের হাড়ভাঙা খাটুনিব ফলে গড়ে দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতি বৎসর মাইনার পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। তাহাব নাম-ধাম বিবরণ পাড়ুই মহাশয় মুখস্থর মত আবৃত্তি করিয়া দিল। ছেলেদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয় তাহাতে নীচেব দু'জন শিক্ষকের কোনমতে ও গভর্মেণ্টের সাহায্যে আর একজনের

সঙ্কুলান হয়; শুধু একজনেব মাহিনাটাই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে চাঁদা তুলিযা সংগ্রহ কবিতে হয়। এই চাঁদা সাধিবার ভাবও মাষ্টাবদেব উপবেই—তাঁহাবা গত তিন-চাবি মাসকাল ক্রমাগত ঘুবিয়া ঘুবিযা প্রত্যেক বাটীতে আট-দশবাব কবিয়া হাঁটা-হাঁটি কবিয়া সাত টাকা চাবি আনাব বেশি আদায় কবিতে পারেন নাই।

কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পাঁচ-ছয়টা গ্রামের মধ্যে এই একটা বিদ্যালয় এবং এই পাঁচ-ছয়টা গ্রামময় তিন-মাস-

কাল ক্রমাগত ঘুরিয়া মাত্র সাত টাকা চারি আনা আদায় হইয়াছে। রমেশ প্রশ্ন করিল, আপনার মাহিনা কত?

মাষ্টার কহিল, রসিদ দিতে হয় ছাব্বিশ টাকার, পাই তের টাকা পনের আনা। কথাটা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাষ্টার তাহা বুঝাইয়া বলিল, আজ্ঞে গভর্মেণ্টের হুকুম কিনা, তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সব-ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে দেখাতে হয়—নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সবাই জানে, আপনি কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন আমি মিথ্যে বলছি নে।

রমেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতে ছাত্রদের কাছে আপনার সম্মানহানি হয় না?

মাষ্টার লজ্জিত হইল। কহিল, কি করব রমেশবাবু। বেণীবাবু এ কয়টি টাকাও দিতে নারাজ।

তিনিই কর্তা বুঝি?

মাষ্টার একবার একটুখানি দ্বিধা করিল; কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়। তাই সে ধীরে ধীরে জানাইল যে, তিনিই সেক্রেটারী বটে, কিন্তু তিনি একটি পয়সাও কখনো খরচ করেন না। যদু মুখুজ্যে মহাশয়ের কন্যা—সতী-লক্ষ্মী তিনি—তাঁর দয়া না থাকিলে ইস্কুল অনেক দিন উঠিয়া যাইত। এ বৎসরই নিজের খরচে চাল ছাইয়া দিবেন আশা দিয়াও হঠাৎ কেন যে সমস্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহার কারণ কেহই বলিতে পারে না।

রমেশ কৌতূহলী হইয়া রমার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর একটি ভাই এ ইস্কুলে পড়ে না?

মাষ্টার কহিল, যতীন তো? পড়ে বইকি।

রমেশ বলিল, আপনার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে, আজ আপনি যান, কাল আমি আপনাদের ওখানে যাব।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হেড্‌মাষ্টার আর একবার রমেশকে প্রণাম করিয়া জোর করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বিদায় হইল।

ছয়

বিশ্বেশ্বরীর সেদিনের কথাটা সেইদিনই দশখানা গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেণী লোকটা নিজে কাহারও মুখের উপর রূঢ় কথা বলিতে পারিত না ; তাই সে গিয়া রমার মাসিকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। সেকালে নাকি তক্ষক দাঁত ফুটাইয়া এক বিরাট অশ্বত্থ গাছ জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছিল। এই মাসিটিও সেদিন সকালবেলায় ঘরে চড়াও হইয়া যে বিষ উদ্‌গীরণ করিয়া গেলেন, তাহাতে বিশ্বেশ্বরীর রক্তমাংসের দেহটা কাঠের নয় বলিয়াই হোক, কিংবা একাল সেকাল নয় বলিয়াই হোক, জ্বলিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল না। সমস্ত অপমান বিশ্বেশ্বরী নীরবে সহ্য করিলেন। কারণ ইহা যে তাঁহার পুত্রের দ্বারাই হইয়াছিল, সে কথা তাঁহার অগোচর ছিল না। পাছে রাগ করিয়া একটা জবাব দিতে গেলেই এই স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া সবার আগে তাঁহার নিজের ছেলের কথাই বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহা রমেশের কর্ণগোচর হয়, এই নিদারুণ লজ্জার ভয়েই সমস্ত সময়টা তিনি কাঠ হইয়া বসিয়াছিলেন।

তবে পাড়াগাঁয়ে কিছুই তো চাপা থাকিবার জো নাই। রমেশ শুনিতে পাইল। ভাবিল ও-বাড়িতে ছুটিয়া গিয়া যা মুখে আসে তাই বলিয়া বেণীকে গালাগালি করিয়া আসে। কারণ, যে লোক মাকে এমন করিয়া অপমান করিতে পারে, তাহাকেও অপমান করা সম্বন্ধে কোনরূপ বাচ-বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহা হয় না। কারণ জ্যাঠাইমার অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। সেদিন দীনুর কাছে এবং কাল মাষ্টারের মুখে শুনিয়া রমার প্রতি তাহার ভারী একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছিল। চতুর্দিকে পরিপূর্ণ মূঢ়তা ও সহস্র প্রকার কদর্য

ক্ষুদ্রতার ভিতরে এক জ্যাঠাইমার হৃদয়টুকু ছাড়া সমস্ত গ্রামটাই আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া যখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন এই মুখুজ্যে-বাটীর পানে চাহিয়া একটুখানি আলোর আভাস—তাহা যত তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র হোক—তাহার মনের মধ্যে বড় আনন্দ দিয়াছিল; কিন্তু আজ আবার এই ঘটনায় তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত মন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। বেণীর সঙ্গে যোগ দিয়া এই দুই মাসি ও বোনঝিতে মিলিয়া যে অন্যায় করিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না; কিন্তু এই দুইটা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধেই বা সে কি করিবে এবং বেণীকেই বা কি করিয়া শাস্তি দিবে তাহাও কোন মতে ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময়ে একটা কাণ্ড ঘটিল। মুখুজ্যে ও ঘোষালদের কয়েকটা বিষয় এখন পর্যন্ত ভাগ হয় নাই। আচার্যদের বাটীর পিছনে 'গড়' বলিয়া পুষ্করিণীটাও এইরূপ উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি। এক সময়ে ইহা বেশ বড়ই ছিল; ক্রমশঃ সংস্কার অভাবে বুজিয়া গিয়া এখন সামান্য একটা ডোবায় পরিণত হইয়াছিল। ভাল মাছ ইহাতে ছাড়া হইত না, ছিলও না। কই, মাগুর প্রভৃতি যে সকল মাছ আপনি জন্মায়, তাহাই কিছু ছিল। ভৈরব হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে গোমস্তা গোপাল সরকার খাতা লিখিতেছিল; ভৈরব ব্যস্ত হইয়া কহিল, সরকারমশাই লোক পাঠান নি? গড় থেকে মাছ ধরানো হচ্ছে যে!

সরকার কলম কানে গুঁজিয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে ধরাচ্ছে?

আবার কে? বেণীবাবুর চাকর দাঁড়িয়ে আছে, মুখুজ্যেদের খোট্টা দরওয়ানটাও আছে দেখলুম; নেই কেবল আপনাদের লোক। শীগ্‌গির পাঠান।

গোপাল কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, কহিল, আমাদের বাবু মাছ মাংস খান না।

ভৈরব কহিল, নাই খেলেন ; কিন্তু ভাগের ভাগ নেওয়া চাই তো !

গোপাল বলিল, আমরা পাঁচজন যা চাই, বাবু বেঁচে থাকলে তিনিও তাই চাইতেন। কিন্তু রমেশবাবু একটু আলাদা ধরনের।

ভৈরব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু পুকুরটা যে আমার বাড়ির পিছনেই—আমার একবার জানান চাই।

গোপাল কহিল, বেশ তো ঠাকুর, একবার জানিয়েই এসো না।

বাটীতে স্ত্রীলোক নাই। সর্বত্রই অবারিত দ্বার। ভৈরব ভিতরে আসিয়া দেখিল, রমেশ সামনের বারান্দায় একখানা ভাঙা ইজি-চেয়ারের উপর পড়িয়া আছে। রমেশকে তাহার কর্তব্যকর্মে উত্তেজিত করিবার জন্য সে সম্পত্তি-রক্ষা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িবামাত্র রমেশ বন্দুকের গুলি খাইয়া ঘুমন্ত বাঘের মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, কি—রোজ রোজ চালাকি নাকি ! ভজুয়া ?

তাহার এই অভাবনীয় এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উগ্রতায় ভৈরব ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই চালাকিটা যে কাহার তাহা সে ঠাহর করিতে পারিল না। ভজুয়া রমেশের গোরখপুর জেলার চাকর ; অত্যন্ত বলবান এবং বিশ্বাসী। লাঠালাঠি করিতে সে রমেশেরই শিষ্য, নিজের হাত পাকাইবার জন্য রমেশ নিজে শিখিয়া ইহাকে শিখাইয়াছিল। ভজুয়া উপস্থিত হইবামাত্র রমেশ তাহাকে খাড়া হুকুম করিয়া দিল—সমস্ত মাছ কাড়িয়া আনিতে এবং যদি কেহ বাধা দেয় তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতে, যদি আনা না সম্ভব হয়, অন্ততঃ তাহার এক পাটি দাঁত যেন ভাঙ্গিয়া দিয়া সে আসে। ভজুয়া তো এই চায়। সে তাহার তেলে-পাকনো লাঠি আনিতে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল। ব্যাপার দেখিয়া ভৈরব ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্তকাল পরেই সুদীর্ঘ বংশদণ্ড-হাতে ভজুয়া ঘরের বাহির হইল এবং সেই লাঠি মাথায় ঠেকাইয়া দূর হইতে রমেশকে নমস্কার করিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই ভৈরব অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া রমেশের

দুই হাত চাপিয়া ধরিল—ওরে ভোজো, যাস্ নে! বাবা রমেশ, রক্ষে কর বাবা, আমি গরীব মানুষ, একদণ্ডও বাঁচব না!

রমেশ বিরক্ত হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। তাহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নাই। ভজুয়া অবাক্ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরব কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল, এ কথা ঢাকা থাকবে না। বেণীবাবুর কোপে পড়ে তা হ'লে একটা দিনও বাঁচব না। আমার ঘর-দোর পর্যন্ত জ্বলে যাবে বাবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও রক্ষা করতে পারবে না!

রমেশ ঘাড় হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া গোপাল সরকার খাতা ফেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, কথাটা ঠিক বাবু।

রমেশ তাহারও কোন জবাব দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া ভজুয়াকে তাহার নিজের কাজে যাইতে আদেশ করিয়া নিজেও নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে কি ভীষণ ঝঞ্ঝার আকারেই এই ভৈরব আচার্যের অপরিসীম ভীতি ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল তাহা শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

সাত

হাঁ রে যতীন, খেলা, করচিস্, ইস্কুল যাবি নে?

আমাদের যে আজ কাল দু'দিন ছুটি দিদি!

রমা ছোট ভাইটিকে কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ছুটি কেন রে যতীন?

যতীন দিদির কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমাদের ইস্কুলের চাল ছাওয়া হচ্চে যে! তারপর চুনকাম হবে—কত বই এসেচে, চার-পাঁচটা চেয়ার টেবিল, একটা আলমারী, একটা খুব বড় ঘড়ি—একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসো না দিদি!

রমা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস্ কি রে!

হাঁ দিদি, সত্যি। রমেশবাবু এসেছেন না—তিনি সব ক'রে দিচ্ছেন। বলিয়া বালক আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কি সুমুখে মাসিকে আসিতে দেখিয়া রমা তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আদর করিয়া কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া করিয়া ছোট ভাইটির মুখ হইতে সে রমেশের ইস্কুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিল। প্রত্যহ দুই-এক ঘণ্টা করিয়া তিনি নিজে পড়াই যান তাহাও শুনিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ রে যতীন, তোকে তিনি চিনতে পারেন?

বালক সগর্বে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ—

কি ব'লে তুই তাঁকে ডাকিস্?

সে কহিল, আমরা ছোটবাবু বলি, কিন্তু তাহার মুখের ভা দেখিয়া রমার বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। সে ভাইকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল ছোটবাবু কি রে! তিনি যে তোর দাদা হন। বেণীবাবুকে যেমন বড়দা ব'লে ডাকিস্, ওঁকে তেমনি ছোড়দা ব'লে ডাকতে পারিস্ নে?

বালক বিস্ময়ে-আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল—আমার দাদা হ তিনি? সত্যি বলছ দিদি?

তাই তো হয় রে, বলিয়া রমা আবার একটু হাসল।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি?

রমা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, এতদিন লেখাপড়া শিখতে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে তোকেও এমনি বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে যতীন?

যতীন প্রশ্ন করিল, ছোটদা'র সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে দিদি?

রমা তেমনি স্নেহ-কোমল কণ্ঠে জবাব দিল, হাঁ ভাই, তাঁর সব পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি ক'রে তুমি জানলে ?

প্রত্যুত্তরে রমা শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল।

যতীন এ লইয়া আর জিদ করিল না। কারণ ইতিমধ্যে হঠাৎ তাহার মাথার মধ্যে আর একটা প্রশ্নের আবির্ভাব হইতে চট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, আচ্ছা দিদি, ছোড়দা কেন আমাদের বাড়ি আসেন না ? বড়দা তো রোজ আসেন।

প্রশ্নটা ঠিক যেন একটা আকস্মিক তীক্ষ্ণ ব্যথার মত রমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের বেগে বহিয়া গেল ; কিন্তু তবুও সে হাসিয়া কহিল, তুই তাঁকে ডেকে আনতে পারিস্ নে ?

এখনি যাব দিদি ? বলিয়া তৎক্ষণাৎ যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওরে, কি পাগলা ছেলে রে তুই, বলিয়া রমা চক্ষের পলকে তাহার ভয়ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। এমন সময়ে মাসির তীব্র আহ্বান কানে আসিতেই রমা যতীনকে ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অনতিকাল পরে তিনি স্বয়ং আসিয়া দ্বারের সম্মুখে বললেন, আমি বলি বুঝি রমা ঘাটে চান করতে গেছে। বলি একাদশী বলে কি এতটা বেলা পর্যন্ত মাথায় একটু তেল-জলও দিতে হবে না ? মুখ শুকিয়ে যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে !

রমা জোব করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, তুমি যাও মাসি আমি এখুনি যাচ্ছি।

যাবি আর কখন ? বেরিয়ে দেখ্‌গে যা, বেণীরা মাছ ভাগ করতে এসেছে।

মাছের নামে যতীন ছুটিয়া চলিয়া গেল। মাসির অলক্ষ্যে রমা আঁচল দিয়া মুখখানা একবার জোর করিয়া মুছিয়া লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণের উপর মহা কোলাহল। মাছ নিতান্ত কম ধরা পড়ে নাই—একটা বড় ঝুড়ির প্রায় একঝুড়ি ভাগ করিবার জন্য বেণী নিজেই হাজির

হইয়াছে। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা আর কোথাও নাই—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

কাসির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই—কি মাছ পড়ল হে বেণী! বলিয়া লাঠি-হাতে ধর্মদাস প্রবেশ করিলেন।

তেমন আর কই পড়ল, বলিয়া বেণী মুখখানা অপ্রসন্ন করিল। জেলেকে ডাকিয়া কহিল আর দেরি করছিস্ কেন রে? শীগ্‌গির ক'রে দু'ভাগ ক'রে ফেল না।

জেলে ভাগ করতে আরম্ভ কবিল।

বেণী নিজের অংশের প্রায় সমস্তটুকু চাকরের মাথায় তুলিয়া দিয়া ধীবরের প্রতি একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিল এবং মুখুজ্যেদের প্রয়োজন অল্প বলিয়া রমার অংশ হইতে উপস্থিত সকলেই যোগ্যতানুসারে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সকলেই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ ঘোষালের সেই বেঁটে হিন্দুস্থানী চাকরটা তাহার মাথার সামনে উঁচু বাঁশের লাঠি হাতে একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লোকটার চেহারা এমনি দুষমনের মত যে সকলের আগে সে চোখে পড়েই এবং একবার পড়িলেই মনে থাকে। গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল; এমন কি, তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ আজগুবি গল্পও ধীরে ধীরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লোকটা এত লোকের মাঝখানে রমাকেই যে কি করিয়া কর্ত্রী বলিয়া চিনিল তাহা সে-ই জানে। দূর হইতে মস্ত একটা সেলাম করিয়া, মাজী বলিয়া সম্বোধন করিয়া সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা যেমনই হোক, কণ্ঠস্বর সত্যই ভয়ানক—অত্যন্ত মোটা এবং ভাঙা। সে একটা সেলাম করিয়া হিন্দী-বাংলা-মেশানো ভাষায় সংক্ষেপে জানাইল যে, সে রমেশবাবুর ভৃত্য এবং মাছের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে।

রমা বিস্ময়ের প্রভাবেই হোক, বা তাহার সঙ্গত প্রার্থনার বিরুদ্ধে কথা খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্যই হোক—সহসা উত্তর করিতে পারিল না। লোকটা চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া বেণীর ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া গম্ভীর গলায় বলিল, এই যাও মাৎ!

চাকরটা ভয়ে চার পা পিছাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। আধ মিনিট পর্যন্ত কোথাও একটু শব্দ নাই; তখন বেণী সাহস করিল। যেখানে ছিল সেইখান হইতে বলিল, কিসের ভাগ?

ভজুয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে একটা সেলাম দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, বাবুজী, আপকো নহি পুছি।

মাসি অনেক দূরে রকের উপর হইতে তীক্ষ্নকণ্ঠে ঝন্ ঝন্ করিয়া বলিলেন, কি রে বাপু মারবি নাকি!

ভজুয়া এক মুহূর্ত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল; পরক্ষণেই তাহার ভাঙা গলায় ভয়ংকর হাসিতে বাড়ি ভরিয়া উঠিল। খানিক পরে হাসি থামাইয়া যেন একটু লজ্জিত হইয়াই পুনরায় রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, মাজী? তাহার কথায় এবং ব্যবহারে অতিশয় সম্ভ্রমের ভিতর যেন অবজ্ঞা লুকানো ছিল, রমা ইহাই কল্পনা করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার কথা কহিল। বলিল, কি চায় তোর বাবু?

রমার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া ভজুয়া হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই যতদূর সাধ্য সেই কর্কশ কণ্ঠ কোমল করিয়া তাহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিল। কিন্তু করিলে কি হয়—মাছ ভাগ হইয়া যে বিলি হইয়া গিয়াছে। এতগুলো লোকের সুমুখে রমা হীন হইতেও পারে না। তাই কটুকণ্ঠে কহিল, তোর বাবুর এতে কোন অংশ নেই। বল্ গে যা, যা পারে তাই করুক গে।

বহুৎ আচ্ছা মাজী! বলিয়া ভজুয়া তৎক্ষণাৎ একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া বেণীর ভৃত্যকে হাত নাড়িয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিল এবং হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রমার মুখের দিকে চাহিয়া

হিন্দী-বাঙলায় মিশাইয়া নিজের কঠোর কণ্ঠস্বরেব জন্য ক্ষমা চাহিল এবং কহিল, মাজী, লোকের কথা শুনিয়া পুকুরধার হইতে মাছ

কাড়িয়া আনিবার জন্য বাবু আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন। বাবুজী কিংবা আমি কেহই আমরা মাছ-মাংস ছুঁই না বটে, কিন্তু— বলিয়া সে নিজেরই প্রশস্ত বুকের উপর করাঘাত করিয়া কহিল, বাবুজীর হুকুমে এই জীউ হয়ত পুকুরধারেই আজ দিতে হইত। কিন্তু রামজী রক্ষা করিয়াছেন; বাবুজীর রাগ পড়িয়া গেল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভজুয়া, যা, মাজীকে জিজ্ঞেস ক'রে

আয়—ও-পুকুরে আমার ভাগ আছে কিনা, বলিয়া সে অতি সম্ভ্রমের সহিত লাঠিসুদ্ধ দুই হাত রমার প্রতি উত্থিত করিয়া নিজের মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, বাবুজী ব'লে দিলেন—আর যে যাই বলুক ভজুয়া, আমি নিশ্চয় জানি মাজীর জবান থেকে কখনও ঝুটা বাৎ বার হবে না—সে কখনও পরের জিনিস ছোঁবে না, বলিয়া সে আন্তরিক সম্ভ্রমের সহিত বারংবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ভজুয়া যাইবামাত্র বেণী মেয়েলী সরু গলায় আস্ফালন করিয়া কহিল. এমনি ক'রে উনি বিষয় রক্ষে করবেন! এই তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞে করছি আমি, আজ থেকে গড়ের একটা শামুক-গুগ্‌লিতেও ওকে হাত দিতে দেব না, বুঝলে না রমা, বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হিঃ-হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

রমার কানে কিন্তু ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। মাজীর মুখ হইতে কখনো ঝুটা বাৎ বাহির হইবে না—ভজুয়ার এই বাক্যটা তখন তাহার দুই কানের ভিতর লক্ষ করতালির সমবেত ঝমাঝম শব্দে যেন মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতেছিল। তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাঙা হইয়াই এমনি শাদা হইয়া গিয়াছিল যেন কোথাও এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। শুধু এই জ্ঞানটা তাহার ছিল, যেন এ মুখের চেহারাটা কাহারও চোখে না পড়ে। তাই সে মাথার আঁচলটা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আট

জ্যাঠাইমা !

কে, রমেশ ? আয় বাবা, ঘরে আয়। বলিয়া আহ্বান করিয়া বিশ্বেশ্বরী তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন। ঘরে পা দিয়াই রমেশ চমকিত হইয়া উঠিল। কারণ জ্যাঠাইমার কাছে যে স্ত্রীলোকটি বসিয়াছিল তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিল—এ রমা। অন্তরে ভারী একটা জ্বালার সহিত রমেশের মনে হইল, ইহারা মাসিকে মাঝখানে রাখিয়া অপমান করিতেও ত্রুটি করে না, আবার নিতান্ত নির্লজ্জের মত নিভৃতে কাছে আসিয়াও বসে। এদিকে রমেশের হঠাৎ উপস্থিতিতে রমারও অবস্থাসঙ্কট কম হয় নাই। কারণ শুধু যে সে এ গ্রামের মেয়ে তাই নয়, রমেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটাও এইরূপ যে, নিতান্ত অপরিচিতার মত ঘোমটা টানিয়া দিতেও লজ্জা করে, না দিয়াও সে স্বস্তি পায় না। তাছাড়া মাছ লইয়া এই যে সেদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাই সব দিক বাঁচাইয়া যতটা পারা যায় সে আড় হইয়া বসিয়াছিল। রমেশ আর সেদিকে চাহিল না। ঘরে যে আর কেহ আছে তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া ধীরে-সুস্থে মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া কহিল, জ্যাঠাইমা !

জ্যাঠাইমা বলিলেন, হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে রমেশ ?

রমেশ কহিল, দুপুরবেলা না এলে তোমার কাছে যে একটু বসতে পাই নে। তোমার কাজ তো কম নয় !

জ্যাঠাইমা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন। রমেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, বহুকাল আগে ছেলেবেলায় একবার তোমার কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম। আবার আজ একবার নিতে এলুম। এই হয়ত শেষ নেওয়া জ্যাঠাইমা।

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এমনই একটা গভীর অবসাদ প্রকাশ পাইল যে, উভয়েই বিস্মৃত-ব্যথায় চমকিয়া উঠিলেন।

বালাই ষাট্! ও কি কথা বাপ্, বলিয়া বিশ্বেশ্বরীর চোখ দুটি যেন ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল।

রমেশ শুধু একটু হাসিল।

বিশ্বেশ্বরী স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, শরীরটা কি এখানে ভাল থাকছে না বাবা?

রমেশ নিজের সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত বলশালী দেহের পানে বার-দুই দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, এ যে খোট্টার দেশের ডাল-রুটির দেহ জ্যাঠাইমা, এ কি এত শীঘ্র খারাপ হয়? তা নয়, শরীর আমার বেশ ভালই আছে, কিন্তু এখানে আমি আর একদণ্ড টিকতে পাচ্ছি নে, সমস্ত প্রাণটা যেন আমার থেকে থেকে খাবি খেয়ে উঠছে।

শরীর খারাপ হয় নাই শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী নিশ্চিন্ত হইয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তোর জন্মস্থান— এখানে টিঁকতে পারছিস্ নে কেন বল্ দেখি?

রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আমি বলতে চাইনে। আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত জানো।

বিশ্বেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সব না জানলেও কতক জানি বটে; কিন্তু সেই জন্যেই তো বলছি, তোর আর কোথাও গেলে চলবে না রমেশ।

রমেশ কহিল, কেন চলবে না জ্যাঠাইমা? কেউ তো এখানে আমাকে চায় না?

জ্যাঠাইমা বলিলেন, চায় না বলেই তো তোকে কোথাও পালিয়ে যেতে আমি দেব না।

ষ্টেশন যাবার পথের ভাঙনটা যে সারাবার চেষ্টা করছিলি তার কি হ'ল?

রমেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, সে হবে না জ্যাঠাইমা—কেউ একটা পয়সা চাঁদা দেবে না।

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, দেবে না বলে হবে না রে! তোর দাদামশায়ের তো তুই অনেক টাকা পেয়েচিস্—এই ক'টা টাকা তুই তো নিজেই দিতে পারিস্।

রমেশ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, কহিল, কেন দেব? আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে যে, না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্যে খরচ করে ফেলেছি। এ গাঁয়ের কারো কিছু করতেই নেই। রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া বলিল, এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে; ভাল করলে গবজ ঠাওরায়, ক্ষমা করাও মহাপাপ, ভাবে—ভয়ে পেছিয়ে গেল।

জ্যাঠাইমা খুব হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু রমার চোখ-মুখ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

রমেশ রাগ করিয়া কহিল, হাসলে যে জ্যাঠাইমা?

না হেসে করি কি বল্ তো বাছা? বলিয়া সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বরং আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার। রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছিস্ রমেশ, বল্ দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে? একটু থামিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, আহা, এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল—তা যদি জানতিস্ রমেশ, এদের ওপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হ'ত। ভগবান যদি দয়া করে তোকে পাঠিয়েছেন—তবে এদের মাঝখানেই তুই থাক্ বাবা।

কিন্তু এরা যে আমাকে চায় না জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, তাই থেকেই কি বুঝতে পারিস্ নে বাবা, এরা তোর রাগ-অভিমানের কত অযোগ্য? আর শুধু এরাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুরে আয়, দেখবি সমস্তই এক।

সহসা রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি যে

সেই থেকে ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে আছ মা ?—হাঁ রমেশ, তোরা দু' ভাই-বোন কি কথাবার্তা বলিস্ নে ?—না মা, সে ক'রো না। ওর বাপের সঙ্গে তোমাদের যা হয়ে গেছে সে ঠাকুরপোর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। সে নিয়ে তোমরা দু'জনে মনান্তর করে থাকলে তো কিছুতেই চলবে না।

রমা মুখ নীচু করিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, আমি মনান্তর রাখতে চাই নে জ্যাঠাইমা ! রমেশদা'—

অকস্মাৎ তাহার মৃদুকণ্ঠ রমেশের গম্ভীর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ঢাকিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল. এর মধ্যে তুমি কিছুতে থেকো না, জ্যাঠাইমা। সেদিন কোনগতিকে ওঁর মাসিব হাতে প্রাণে বেঁচেছ ; আজ আবার উনি গিয়ে যদি তাঁকে পাঠিয়ে দেন—একেবারে তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে তবে তিনি বাড়ি ফিরবেন, বলিয়াই কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিলেন, যাস্ নে রমেশ, কথা শুনে যা।

রমেশ দ্বারের বাহির হইতে বলিল, না জ্যাঠাইমা, যারা অহংকারের স্পর্ধায় তোমাকে পর্যন্ত পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে, তাদের হয়ে একটি কথাও তুমি বলো না, বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্বেই চলিয়া গেল।

বিহ্বলের মত রমা কয়েক মুহূর্ত বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা ? আমি কি মাসিকে শিখিয়ে দিই, না তার জন্যে আমি দায়ী ?

জ্যাঠাইমা তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, শিখিয়ে যে দাও না এ কথা সত্যি ; কিন্তু তাঁর জন্যে দায়ী তোমাকে কতকটা হ'তে হয় বইকি মা !

রমা অন্য হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ অভিমানে সতেজে অস্বীকার করিয়া বলিল, কেন দায়ী ? কখ্খনো না। আমি যে

এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না জ্যাঠাইমা! তবে কেন আমাকে উনি মিথ্যে দোষ দিয়ে অপমান ক'রে গেলেন?

বিশ্বেশ্বরী ইহা লইয়া আর তর্ক করিলেন না। ধীরভাবে বলিলেন, সকলে তো ভেতরের কথা জানতে পারে না মা। কিন্তু তোমাকে অপমান করবার ইচ্ছে ওর কখনো নেই এ কথা তোমাকে আমি নিশ্চয় বলতে পারি। তুমি তো জান না মা, কিন্তু আমি গোপাল সরকারের মুখে শুনে টের পেয়েছি তোমার ওপর ওর কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস; সেদিন তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে দু'ঘরে যখন ভাগ ক'রে নিলে, তখন ও কারো কথায় কান দেয়নি যে ওর তাতে অংশ ছিল। তাদের মুখের ওপর হেসে বলেছিল, চিন্তার কারণ নেই—রমা যখন আছে তখন আমার ন্যায্য অংশ আমি পাবই; সে কখনো পরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আমি ঠিক জানি মা, এত বিবাদ-বিসংবাদের পরেও তোমার ওপর ওর সেই বিশ্বাসই ছিল, যদি না সেদিন গড়-পুকুরের --

কথাটার মাঝখানেই বিশ্বেশ্বরী সহসা থামিয়া গিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া রমার আনত শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, আজ একটা কথা বলি মা তোমাকে, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করার দাম যতই হোক রমা, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক বেশি। কারো কথায়, কোন বস্তুর লোভেতেই মা সেই জিনিসটিকে তোমার চারিদিক থেকে ঘা মেরে নষ্ট করে ফেলো না। দেশের যে ক্ষতি তাতে হবে, আমি নিশ্চয় বলছি তোমাকে, কোন কিছু দিয়েই আর তার পূরণ হবে না।

রমা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না। বিশ্বেশ্বরী আর কিছু বলিলেন না। খানিক পরে রমা অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেলা গেল, আজ যাই জ্যাঠাইমা, বলিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া চলিয়া গেল।

নয়

রমেশ বাড়িতে পা দিতেই দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একটি এগার-বার বছরের ছেলেকে লইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু না জানিয়া শুধু ছেলেটির মুখ দেখিয়াই রমেশের বুকের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। গোপাল সরকার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া লিখিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া কহিল, ছেলেটি দক্ষিণপাড়ার দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য এসেছে।

ভিক্ষার নাম শুনিয়াই রমেশ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি শুধু ভিক্ষে দিতেই বাড়ি এসেছি সরকারমশায়? গ্রামে কি আর লোক নেই?

গোপাল সরকার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে ঠিক কথা বাবু; কিন্তু কর্তা তো কখনও কারুকে ফেরাতেন না; তাই দায়ে পড়লেই এই বাড়ির দিকেই লোকে ছুটে আসে।

ছেলেটির পানে চাহিয়া প্রৌঢ়াটিকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, হাঁ কামিনীর মা, এদের দোষও তো কম নয় বাছা! জ্যান্ত থাকতে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দিলে না, এখন মড়া যখন ওঠে না, তখন টাকার জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছে! ঘরে ঘটিটা বাটিটাও কি নেই বাপু?

কামিনীর মা জাতিতে সদ্‌গোপ, এই ছেলেটির প্রতিবেশী। মাথা নাড়িয়া বলিল, বিশ্বেস না হয় বাপু, গিয়ে দেখবে চল। আর কিছু থাকলে কি মরা-বাপ ফেলে একে ভিক্ষে করতে আনি। চোখে না দেখলেও শুনেচ তো সব? এই ছ'মাস ধ'রে আমার যথাসর্বস্ব এই জন্যেই ঢেলে দিয়েছি। বলি, ঘরের পাশে বামুনের ছেলে-মেয়ে না খেতে পেয়ে মরবে!

রমেশ এই ব্যাপরাটা কতক যেন অনুমান করিতে পারিল।

গোপাল সরকার তখন বুঝাইয়া কহিল, এই ছেলেটির বাপ—দ্বারিক চক্রবর্তী ছয় মাস হইতে কাসরোগে শয্যাগত থাকিয়া আজ ভোর-বেলায় মরিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া কেহ শব স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয় মাসকাল তাহার সর্বস্ব এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে। আর তাহারও কিছু নাই। সেইজন্য ছেলেটিকে লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে।

রমেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেলা তো প্রায় দুটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয় মড়া পড়েই থাকবে?

সরকার হাবিয়া কহিল, উপায় কি বাবু! অশাস্তর কাজ তো আর হ'তে পারে না। আর এতে পাড়ার লোককেই বা দোষ দেবে কে বলুন—যা হোক, মড়া পড়ে থাকবে না; যেমন ক'রে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে। তাই তো ভিক্ষে—হাঁ কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে?

ছেলেটি মুঠা খুলিয়া একটি সিকি ও চারিটি পয়সা দেখাইল। কামিনীর মা বলিল, সিকি মুখুজ্যেরা দিয়েছে, আর পয়সা চারিটি হালদারমশাই দিয়েছেন। কিন্তু যেমন ক'রে হোক ন'সিকের কমে তো হবে না! তাই, বাবু যদি—

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তোমরা বাড়ি যাও বাপু, আর কোথাও যেতে হবে না। আমি এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদের বিদায় করিয়া দিয়া রমেশ গোপাল সরকারের মুখের প্রতি অত্যন্ত ব্যথিত দুই চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, এমন গরীব এ গাঁয়ে আর কয় ঘর আছে জানেন আপনি?

সরকার কহিল, দু তিন ঘর আছে, বেশি নাই। এদেরও মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল বাবু, শুধু একটা চালদা গাছ নিয়ে মামলা ক'রে দ্বারিক চক্কোত্তি আর সনাতন হাজরা দু'ঘরই বছর-পাঁচেক আগে শেষ হ'য়ে গেল। গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল,

এতদূর গড়াত না বাবু, শুধু আমাদের বড়বাবু আর গোবিন্দ গাঙুলী দু'জনকেই নাচিয়ে তুলে এতটা ক'রে তুললেন।

তারপর ?

সরকার কহিল, তারপর আমাদের বড়বাবুর কাছেই দু'ঘরের গলা পর্যন্ত এতদিন বাঁধা ছিল। গত বৎসর উনি সুদে-আসলে সমস্তই কিনে নিয়েছেন। হাঁ, চাষার মেয়ে বটে ওই কামিনীর মা! অসময়ে বামুনের যা করলে এমন দেখতে পাওয়া যায় না!

রমেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর গোপাল সরকারকে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া মনে মনে বলিল, তোমার আদেশ মাথায় তুলে নিলাম জ্যাঠাইমা। মরি এখানে সেও ঢের ভাল, কিন্তু এ দুর্ভাগ্য গ্রাম ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইব না।

দশ

মাস-তিনেক পরে একদিন সকালবেলা তারকেশ্বরের যে পুষ্করিণীটিকে দুধপুকুর বলে, তাহারই সিঁড়ির উপর একটি রমণীর সহিত রমেশের একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে এমনি অভিভূত হইয়া অভদ্রভাবে তাহার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যে, তাহার তৎক্ষণাৎ পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার কথা মনেই হইল না। মেয়েটির বয়স বোধ করি কুড়ির অধিক নয়। স্নান করিয়া উপরে উঠিতেছিল, তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসনতলে দুই বাহু বুকের উপর জড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনি এখানে যে ?

রমেশের বিস্ময়ের অবধি ছিল না; কিন্তু তাহার বিহ্বলতা ঘুচিয়া

গেল। একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাকে চেনেন?

মেয়েটি কহিল, চিনি। আপনি কখন্ তারকেশ্বরে এলেন?

রমেশ কহিল, আজই ভোরবেলা। আমার মামারবাড়ি থেকে মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা আসেন নি।

এখানে কোথায় আছেন?

রমেশ কহিল, কোথাও না। আমি আর কখনো এখানে আসিনি; কিন্তু আজকের দিনটা কোনমতে কোথাও অপেক্ষা ক'রে থাকতেই হবে। যেখানে হোক একটা আশ্রয় খুঁজে নেব।

সঙ্গে চাকর আছে তো?

না, আমি একাই এসেছি।

বেশ যা হোক, বলিয়া মেয়েটি হাসিয়া মুখ তুলিতেই আবার দু'জনের চোখোচোখি হইল। সে চোখ নামাইয়া লইয়া মনে মনে বোধ করি একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, তবে আমার সঙ্গেই আসুন; বলিয়া ঘটিটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

রমেশ বিপদে পড়িল। কহিল, আমি যেতে পারি, কেন না, এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাকতেন না। আপনাকে আমি যে চিনি না, তাও নয়; কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি নে। আপনার পরিচয় দিন।

তবে মন্দিরের বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি পূজোটা সেরে নিই। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব, বলিয়া মেয়েটি মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। রমেশ মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল।

আধঘণ্টা পরে পূজা সারিয়া মেয়েটি আবার যখন বাহিরে আসিল রমেশ আর একবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল, কিন্তু তেমনই অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই?

মেয়েটি উত্তর দিল, না। দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করছে। আমি প্রায়ই এখানে আসি, সমস্ত চিনি।

কিন্তু আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পথ চলিবার পরে বলিল, নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারী কষ্ট হ'ত। আমি রমা।

* * *

সম্মুখে বসিয়া আহার করাইয়া পান দিয়া বিশ্রামের জন্য নিজের হাতে সতরঞ্জি পাতিয়া রমা অন্য ঘরে চলিয়া গেল। এই শয্যায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া রমেশের মনে হইল, তাহার সেই তেইশ বছরের জীবনটা এই একটা বেলার মধ্যে যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতেই তাহার বিদেশে পরাশ্রয়ে কাটিয়াছে। খাওয়াটার মধ্যে পেট-ভরানোর বেশি আর কিছু যে কোন অবস্থাতেই থাকিতে পারে ইহা সে জানিত না। তাই আজিকার এই পরিতৃপ্তিব মধ্যে তাহার সমস্ত মন বিস্ময়ে-মাধুর্যে একেবারে যেন ডুবিয়া গেল।

দিবানিদ্রা রমেশের অভ্যাস ছিল না। তাহার সুমুখের ছোট জানালার বাহিরে নব-বর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল; অর্ধ-নিমীলিত চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার আত্মীয়গণের আসা-না-আসার কথা আর তাহার মনেই ছিল না। হঠাৎ রমার মৃদুকণ্ঠ তাহার কানে গেল। সে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, আজ যখন বাড়ি যাওয়া হবে না তখন এই খানেই থাকুন।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু যাঁর বাড়ি তাঁকে এখনো তো দেখতে পেলাম না। তিনি না বললে থাকি কি ক'রে?

রমা সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রত্যুত্তরে কহিল, তিনিই বলচেন থাকতে। এ বাড়ি আমার।

রমেশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, এ স্থানে বাড়ি কেন?

রমা বলিল, এ স্থানটা আমার খুব ভাল লাগে। প্রায়ই এসে থাকি। এখন লোক নেই বটে, কিন্তু এমন সময় সময় হয় যে, পা বাড়াবার জায়গা থাকে না।

রমেশ কহিল, বেশ তো, তেমন সময় না এলে?

রমা নীরবে একটু হাসিল। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তারকনাথ ঠাকুরের উপর বোধ করি তোমাদের খুব ভক্তি, না?

রমা বলিল, তেমন ভক্তি আর হয় কই? কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করতে হবে তো।

রমেশ আর কোন প্রশ্ন করিল না। রমা সেইখানেই চৌকাঠ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়া অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল,, রাত্রে আপনি কি খান?

রমেশ হাসিয়া কহিল, যা জোটে তাই খাই। আমার খেতে বসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো খাবার কথা মনে হয় না। তাই বামুনঠাকুরের বিবেচনার উপরেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

রমা কহিল, এত বৈরাগ্য কেন?

ইহা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ কিংবা সরল পরিহাস মাত্র, তাহা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সংক্ষেপে জবাব দিল, না। এ শুধু আলস্য।

কিন্তু পরের কাজে তো আপনার আলস্য দেখি নে?

রমেশ কহিল, তার কারণ আছে। পরের কাজে আলস্য করলে ভগবানের কাছে জবাবদিহিতে পড়তে হয়। নিজের. কাজেও হয়ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই অত নয়।

রমা একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, আপনার টাকা আছে, তাই আপনি পরের কাজে মন দিতে পারেন, কিন্তু যাদের নেই?

রমেশ বলিল, তাদের কথা জানি নে রমা। কেন না, টাকা থাকারও কোন পরিমাণ নেই, মন দেবারও কোন ধরা-বাঁধা ওজন নেই। টাকা থাকা-না-থাকার হিসেব তিনিই জানেন যিনি ইহ-পরকালের ভার নিয়েছেন।

রমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু পরকালের চিন্তা করবার বয়স তো আপনার হয়নি। আপনি আমার চেয়ে শুধু তিন বছরের বড়।

রমেশ হাসিয়া বলিল, তার মানে তোমার আরও হয়নি। ভগবান তাই করুন, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক; কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে আজই যে আমার শেষ দিন নয় এ কথা কখনও মনে করিনে।

তাহার কথার মধ্যে যেটুকু প্রচ্ছন্ন আঘাত ছিল তাহা বোধ করি বৃথা হয় নাই। একটুখানি স্থির থাকিয়া রমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, আপনাকে সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে তো দেখলুম না। মন্দিরের মধ্যে কি আছে-না-আছে তা না হয় নাই দেখলেন, কিন্তু খেতে ব'সে গণ্ডূষ করাটাও কি ভুলে গেছেন?

রমেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল, ভুলিনি বটে, কিন্তু ভুললেও কোন ক্ষতি বিবেচনা করি নে; কিন্তু এ কথা কেন?

রমা বলিল, পরকালের ভাবনাটা আপনার খুব বেশি কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

রমেশ ইহার জবাব দিল না, তাহার পর কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া রহিল। রমা আস্তে আস্তে বলিল, দেখুন আমাকে দীর্ঘজীবী হতে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিধবার দীর্ঘজীবন কোন আত্মীয় কোন দিন কামনা করে না।

এ কথার উত্তরে রমেশ শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে রমার মতই ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু তোমাকে স্মরণ করেই বলছি, আজ আমার এ কথা কোনমতেই মনে হচ্ছে না। আমি তোমার তো কেউ নই রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী ব'লে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলুম, সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে নিত্য পায়, আমার তো মনে হয় পরের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তারা পাগল হ'য়ে ছোটে। এইমাত্র আমি একা ব'সে চুপ করে ভাবছিলুম, আমার সমস্ত জীবনটি যেন তুমি এই একটা বেলার মধ্যে আগাগোড়া বদলে দিয়েছ। এমন ক'রে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন ক'রে আমাকে কেউ কোন দিন খাওয়ায় নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জানলাম রমা।

কথা শুনিয়া রমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া বলিল, এ ভুলতে আপনার বেশি দিন

লাগবে না। যদি বা একদিন মনেও পড়ে, অতি তুচ্ছ বলেই মনে পড়বে।

রমেশ কোনও উত্তর করিল না। রমা কহিল, দেশে গিয়ে যে নিন্দে করবেন না এই আমার ভাগ্য।

রমেশ আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না রমা, নিন্দেও করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দা-সুখ্যাতির বাইরে।

রমা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের ঘরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে নির্জন ঘরের মধ্যে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ্‌টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এগার

দুই দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়া অপরাহ্নবেলায় একটু ধরণ করিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে গোপাল সরকারের কাছে বসিয়া রমেশ জমিদারীর হিসাব-পত্র দেখিতেছিল; অকস্মাৎ প্রায় কুড়িজন কৃষক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—ছোটবাবু, এ যাত্রা রক্ষে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধ'রে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।

রমেশ অবাক হইয়া কহিল, ব্যাপার কি?

চাষারা কহিল, একশ বিঘের মাঠ ডুবে গেল, জল বার করে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গাঁয়ে একটা ঘরও খেতে পাবে না।

কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। গোপাল সরকার তাদের দুই-একটা প্রশ্ন করিয়া ব্যাপারটা রমেশকে বুঝাইয়া দিল। একশ বিঘার মাঠটাই এ গ্রামের একমাত্র ভরসা। সমস্ত চাষীদের কিছু

কিছু জমি তাহাতে আছে। ইহার পূর্বধারে সরকারী প্রকাণ্ড বাঁধ, পশ্চিম ও উত্তরধারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুজ্যেদের। এই দিক দিয়া জল নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মত আছে। বৎসরে দু'শ টাকার মাছ বিক্রী হয় বলিয়া জমিদার বেণীবাবু তাহা কড়া পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষারা আজ সকাল হইতে তাঁহার কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এইমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে।

রমেশ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বেণী তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছে এবং কাছে হালদার মহাশয় বসিয়া আছেন ; বোধ করি এই কথাই হইতেছিল। রমেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, জলার বাঁধ আটকে রাখলে তো আর চলবে না, এখনি সেটা কেটে দিতেই হবে।

বেণী হুঁকাটা হালদারের হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কোন্ বাঁধটা ?

রমেশ উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছিল, ক্রুদ্ধভাবে কহিল, জলার বাঁধ আর ক'টা আছে বড়'দা ? না কাটালে সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে যাবে। জল বার ক'রে দেবার হুকুম দিন।

বেণী কহিল, সেই সঙ্গে দু'তিনশ টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে সে খবরটা রেখছ কি ? এ টাকাটা দেবে কে ? চাষারা, না তুমি ?

রমেশ রাগ সামলাইয়া বলিল, চাষারা গরীব ; তারা দিতে তো পারবেই না, আর আমিই বা কেন দেব সে বুঝতে পারি নে।

বেণী জবাব দিল, তা হ'লে আমরাই বা কেন এত লোকসান করতে যাব সে তো আমি বুঝতে পারি নে।

রমেশ বিনীতভাবে বলিল, ভেবে দেখুন বড়'দা, আমাদের তিন ঘরের দু'শ টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের

অন্ন মারা যাবে। যেমন ক'রে হোক, পাঁচ-সাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই।

বেণী হাতটা উল্টাইয়া বলিল, হ'ল হ'লই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, আমার গোটা সদরটা কোপালেও তো দুটো পয়সা বার হবে না যে ও-শালাদের জন্য দু-দু'শ টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?

রমেশ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, এরা সারা বছর খাবে কি?

যেন ভারী হাসির কথা! বেণী একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ হেলিয়া দুলিয়া, মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া, থুথু ফেলিয়া, শেষে স্থির হইয়া কহিল, খাবে কি? দেখবে ব্যাটারা, যে-যার জমি বন্ধক রেখে, ধার-কর্জ ক'রে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেছে কেন?

ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রমেশের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত রাখিয়াই সে বলিল, আপনি যখন কিছুই করবেন না ব'লে স্থির করেছেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমি রমার কাছে চললুম, তার মত হলে আপনার একার অমতে কিছুই হবে না।

প্রাঙ্গণে তুলসীমূলে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়া প্রণাম সাঙ্গ করিয়া রমা মুখ তুলিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। ঠিক সুমুখেই রমেশ দাঁড়াইয়া। তাহার মাথার আঁচল গলায় জড়ানো। ঠিক যেন সে এইমাত্র রমেশকেই নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল। ক্রোধের উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় মাসির সেই প্রথম দিনের নিষেধ-বাক্য রমেশের স্মরণ ছিল না; তাই সে সোজা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং রমাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল। দু'জনের মাসখানেক পর দেখা।

রমেশ কহিল, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেছ। জল বার ক'রে দেবার জন্যে তোমার মত নিতে এসেছি।

রমার বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেল; সে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিল, সে কেমন করে হবে? তাছাড়া বড়দা'র মত নেই।

নেই জানি। তাঁর একলার অমতে কিছুই আসে যায় না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, জল বার করে দেওয়া উচিত বটে, কিন্তু মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন?

রমেশ কহিল, অত জলে কোন বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ বছর সে টাকাটা আমাদের ক্ষতি-স্বীকার করতে হবে। না হলে গ্রাম মারা যায়।

রমা চুপ করিয়া রহিল।

রমেশ কহিল, তা হলে অনুমতি দিলে?

রমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, অত টাকা লোকসান আমি করতে পারব না।

রমেশ মিনতির কণ্ঠে কহিল, রমা, এ ক'টা টাকা? তোমাদের অবস্থা এদিকের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়, আমি মিনতি করে জানাচ্ছি রমা, এর জন্যে এত লোকের অন্নকষ্ট করে দিয়ো না। যথার্থ বলছি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

রমা তেমনি মৃদুভাবেই জবাব দিল, নিজের ক্ষতি করতে পারিনি বলে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই। ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতিপূরণ করে দিন না?

তাহার মৃদুস্বরে বিদ্রূপ কল্পনা করিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, রমা, মানুষ খাঁটি কিনা, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়ে উঠে। তোমারও আজ তাই পেল। কিন্তু তোমাকে আমি এমন ক'রে ভাবিনি। চিরকাল ভেবেছি তুমি এর চেয়ে অনেক উঁচুতে; কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি নীচ, অতি ছোটো।

অসহ্য বিস্ময়ে রমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কি আমি ?

রমেশ কহিল, তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ-ফুটে এ কথা বলতে পারেন নি; পুরুষমানুষ হয়ে তাঁর মুখে যা বেধেছে, স্ত্রীলোক হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি। আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষতিপূরণ করতে পারি, কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে ব'লে দিচ্ছি রমা, সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা সব-চেয়ে বেশি। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেছ।

কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আর একবিন্দু রস পাবে না তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। আমি কি করব তাও এইসঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখনি জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেব—তোমরা পার আটকাবার চেষ্টা কর গে, বলিয়া রমেশ চলিয়া গেল।

তখন রাত্রি বোধ করি এগারোটা। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা-গলার আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর আবছা জ্যোৎস্না বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—পরণের বস্ত্র রক্তে রাঙা, কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা গলায় অনুনয় করিতেছে, কথা শোন্ আকবর, থানায় চল্। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি তো ঘোষাল-বংশের ছেলে নই আমি। পিছনে চাহিয়া কহিল, রমা, তুমি একবার বল না, চুপ করে রইলে কেন ?

কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মত নীরবে বসিয়া রইল।

আকবর আলি একবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, সাবাস্! হ্যাঁ—মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটবাবু! লাঠি ধরলে বটে!

বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, সেই কথা বলতেই তো বলছি আকবর! কার লাঠিতে তুই জখম হলি! সেই ছোঁড়ার, না তার সেই হিন্দুস্থানী চাকরটাব?

আকবরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল। সে কহিল সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার! সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু? কি বলিস্ রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?

আকবরের দুই ছেলে অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, আমার হাতে চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই বাপ ক'বে ব'সে পড়ল বড়বাবু!

রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরপুরের প্রজা। সাবেক দিনের লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পর ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে! সে নিজেই যে এত বড় লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তখন ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক করে দাঁড়াল দিদিঠাকরাণ, তিন ব্যাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম! আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতি লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কাটতেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও তো জমি-জমা আছে, সমঝে দেখ্ রে, সে বরবাদ হয়ে গেলে তোর কেমন লাগে?

মুই সেলাম করে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে কয় সম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ্ কোদল মারছে, ওদের মুণ্ডু কটা ফাঁক করে দিয়ে যাই।

বেণী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানে চেঁচাইয়া কহিল, বেইমান ব্যাটারা—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্ছে—

তাহারা তিন বাপ-ব্যাটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশ কণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়বাবু, বেইমান ক'য়ো না; মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারি না।

কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ

করিয়া কহিল, অ্যারে বেইমন কয় দিদি? ঘরের মধ্যি বসে বেইমান কইচ বড়বাবু, চোখে দেখলি জানতে পারতে ছোটবাবু কি?

বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোকে মেরেছে!

আকবর জিভ কাটিয়া বলিল, তোবা তোবা, দিনকে রাত করতি বলো বড়বাবু?

বেণী কহিল, না হয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় যা—কাল ওয়ারেণ্ট বার করে একেবারে হাজতে পূরব। রমা তুমি ভাল করে আর একবার বুঝিয়ে বল না। এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না!

রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদিঠাকরাণ, ও পারব না।

বেণী ধমক দিয়া কহিল, পারবি নে কেন?

এবার আকবরও চেঁচাইয়া কহিল, কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোক মোরে সর্দার কয় না? দিদি-ঠাকরাণ, তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল্ খাটতে পারি, ফৈরিদি হ'ব কোন্ কালা-মুয়ে?

রমা মৃদুকণ্ঠে একবারমাত্র কহিল, পারবে না আকবর?

আকবর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল না দিদিঠাকরাণ, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট্ দেখাতে পারি না। ওঠ্ রে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতে পারব না, বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বারো

খালের ও-পারে পিরপুর গ্রাম রমেশদেরই জমিদারী। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া রমেশের কাছে উপস্থিত হইল; এই বলিয়া নালিশ জানাইল যে, যদিও তাহারা তাঁহাদের প্রজা, তথাচ তাহাদের ছেলেপুলেকে মুসলমান বলিয়া গ্রামের স্কুলে ভর্তি হইতে দেওয়া হয় না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া তাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছে, মাষ্টার মহাশয়রা কোনমতেই তাহাদের ছেলেদের গ্রহণ করেন না। রমেশ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এমন অন্যায় অত্যাচার তো কখনও শুনিনি? তোমাদের ছেলেদের আজই নিয়ে এসো, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভর্তি করে দেবো।

তাহারা জানাইল, যদিচ তাহারা প্রজা বটে, কিন্তু খাজনা দিয়াই জমি ভোগ করে। সেজন্য হিঁদুর মত জমিদারকে তাহারা ভয় করে না; কিন্তু এক্ষেত্রে বিবাদ করিয়াও লাভ নাই। কারণ ইহাতে বিবাদই হইবে, যথার্থ উপকার কিছুই হইবে না। বরঞ্চ তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা ছোট রকমের স্কুল করিতে ইচ্ছা করে এবং ছোটবাবু একটু সাহায্য করিলেই হয়। কলহ-বিবাদে রমেশ নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাকে আর বাড়াইয়া না তুলিয়া ইহাদের পরামর্শ সুযুক্তি বিবেচনা করিয়া সায় দিল এবং তখন হইতে এই নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপৃত হইল।

নানা কারণে অনেকদিন হইতে তাহার জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হয় না। সেই মারামারির পর হইতে কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সে সেদিকে যায় নাই। আজ ভোরে উঠিয়া সে একেবারে তাঁর ঘরের দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যাঠাইমার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর তাহার এমন বিশ্বাস ছিল যে সে-কথা তিনি নিজেও জানিতেন

না। রমেশ একটুখানি আশ্চর্য হইয়াই দেখিল, জ্যাঠাইমা এত প্রত্যূষেই স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের মেঝেয় বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। তিনিও বিস্মিত কম হইলেন না। বইখানি বন্ধ করিয়া তাহাকে আদর করিয়া ঘরে ডাকিয়া বসাইলেন এবং মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত সকালে যে রে ?

রমেশ কহিল, অনেকদিন তোমাকে দেখতে পাইনি জ্যাঠাইমা। আমি পিরপুরে একটা ইস্কুল করছি।

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, শুনেছি ; কিন্তু আমাদের ইস্কুলে আর পড়াতে যাস্ নে কেন বল্ তো ?

রমেশ কহিল, সেই কথাই বলতে এসেছি জ্যাঠাইমা। এদের মঙ্গলের চেষ্টা করা শুধ পণ্ডশ্রম। যারা কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না, অভিমান অহংকার যাদেব এত বেশী, তাদের মধ্যে খেটে-মরায় লাভ কিছুই নেই, শুধু মাঝ থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে ওঠে। বরং যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় সত্যিকার মঙ্গল হবে, আমি সেইখানে পরিশ্রম করব।

জ্যাঠাইমা কহিলেন, এ কথা তো নতুন নয় রমেশ ! পৃথিবীতে ভালো করবার ভার যে-কেউ নিজের উপর নিয়েছে, চিরদিনই তার শত্রু-সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। সেই ভয়ে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায় তুইও তাদের দলে গিয়ে যদি মিশিস্, তা হলে তো চলবে না বাবা। এ গুরুভার ভগবান তোকেই বইতে দিয়েছেন, তোকেই ব'য়ে বেড়াতে হবে ; কিন্তু হাঁ রে রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতের জল খাস্ ?

রমেশ হাসিয়া কহিল, ওই গ্যাখ জ্যাঠাইমা, এর মধ্যেই তোমার কানে উঠেছে। এখনো খাইনি বটে, কিন্তু খেতে তো আমি কোন দোষ দেখি নে। আমি তোমাদের জাতিভেদ মানি নে।

জ্যাঠাইমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, মানিস্ নে কি রে ? এ কি মিছে কথা, না জাতিভেদ নেই, যে তুই মানবি নে ?

রমেশ কহিল, ঠিক ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে আজ তোমার কাছে এসেছিলাম জ্যাঠাইমা। জাতিভেদ আছে তা মানি, কিন্তু একে ভাল ব'লে মানি নে।

কেন?

রমেশ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কেন সে কি তোমাকে বলতে হবে? এর থেকেই যত মনোমালিন্য, যত বাদাবাদি, এ কি তোমার জানা নেই?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, ঠিক কথা নয় বাবা, একটুও ঠিক কথা নয়। এ তোমাদের শহর নয়। পাড়াগাঁয়ে জাত ছোট কি বড় সে জন্যে কারো এতটুকু মাথাব্যথা নেই, ছোটভাই যেমন ছোট বলে বড়ভাইকে হিংসা করে না, দু-এক বছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, পাড়াগাঁয়েও ঠিক তেমনি। এখানে কায়েত বামুন হয়নি বলে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্তও কায়েতের সমান হবার জন্যে একটুও চেষ্টা করে না। বড়ভাইকে একটা প্রণাম কবতে ছোটভায়ের যেমন লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তেমনি কায়েত-বামুনের একটুখানি পায়ের ধুলো নিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। সে নয় বাবা, জাতিভেদ-টেদ হিংসে-বিদ্বেষের হেতুই নয়। অন্ততঃ বাঙালীর যা মেরুদণ্ড—সেই পল্লীগ্রামে নয়।

রমেশ মনে মনে আশ্চর্য হইয়া কহিল, তবে কেন এমন হয় জ্যাঠাইমা? ও-গাঁয়ে তো এত ঘর মুসলমান আছে, তাদের মধ্যে তো এমন বিবাদ নেই। একজন আর একজনকে বিপদের মধ্যে এমন করে তো চেপে ধরে না—সেদিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলে কেউ তার মৃতদেহটাকে ছুঁতে পর্যন্ত যায়নি —সে তো তুমি জান।

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, জানি বাবা সব জানি; কিন্তু জাতিভেদ তার কারণ নয়। কারণ এই যে মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যকার

একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই। যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েছে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ হতাশভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, আছে বই কি বাবা। প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েছিস্ শুধু সেই পথ। তাই তো তোকে কেবলি বলি, তুই জন্মভূমিকে কিছুতেই ছেড়ে যাস নে।

কেন জ্যাঠাইমা, জন্মভূমি শুধু তো আমার একার নয়?

জ্যাঠাইমা উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন, তোর একার বই কি বাবা, শুধু তোরই মা। দেখতে পাস্ নে, মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোন দিনই কিছু দাবী করেন নি। তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌঁছতে পাবে নি, কিন্তু তুই আসামাত্রই শুনতে পেয়েছিলি।

রমেশ আর তর্ক করিল না। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে বিশ্বেশ্বরীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ভক্তি, করুণা ও কর্তব্যের একান্ত নিষ্ঠায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া রমেশ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। তাহার ঘরের পূর্বদিকে মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে স্তব্ধ হইয়া আকাশের গানে চাহিয়াছিল, সহসা শিশুকণ্ঠের আহ্বানে সে চমকিয়া মুখ ফিরাইতে দেখিল রমার ছোট ভাই যতীন দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া লজ্জায় আরক্তমুখে ডাকিতেছে, ছোড়দা!

রমেশ কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে ডাকছ যতীন?

আপনাকে।

আমাকে? আমাকে ছোড়দা বলতে তোমাকে কে বলে দিলে?

দিদি।

দিদি! তিনি কি কিছু বলতে তোমাকে পাঠিয়েছেন?

যতীন মাথা নাড়িয়া কহিল, দিদি বললেন, আমাকে সঙ্গে ক'রে তোর ছোড়দা'র বাড়িতে নিয়ে চল্—ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, বলিয়া সে দরজার দিকে চাহিল।

রমেশ বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখিল, রমা একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। সরিয়া আসিয়া সবিনয়ে কহিল, আজ আমার এ কি সৌভাগ্য! কিন্তু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে, নিজে কষ্ট করে এলে কেন! এসো, ঘরে এসো।

রমা একবার ইতস্ততঃ করিল, তারপর যতীনের হাত ধরিয়া রমেশের অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল, আজ একটা জিনিস ভিক্ষে চাইতে আপনার বাড়িতেই এসেছি—বলুন, দেবেন? বলিয়া সে রমেশের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। রমেশ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, কি চাই বল?

তাহার অস্বাভাবিক শুষ্কতা রমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তেমনি মুখের প্রতি চোখ রাখিয়া কহিল, আগে কথা দিন।

রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, তা পারি নে। তোমাকে কিছুমাত্র প্রশ্ন না করেই আমার কথা দেবার শক্তি তুমি নিজের হাতেই ভেঙে দিয়েছ, রমা!

রমা আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমি!

রমেশ বলিল, তুমি ছাড়া এ শক্তি আর কারু ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বলব। ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করো, না হয় করো না; কিন্তু শুনে রাগ ক'রো না, কিছুমাত্র লজ্জাও পেয়ো না। মনে করো এ কোন পুরাকালের একটা গল্প শুনছ মাত্র।

তোমাকে ভালোবাসতাম রমা! আজ আমার মনে হয় তেমন ভালো-বাসা বোধ করি কেউ কখনো বাসেনি: ছেলেবেলায় মার মুখে শুনতাম আমাদের বিয়ে হবে। তারপরে যেদিন সমস্ত আশা ভেঙে গেল সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, আজও আমার তা মনে পড়ে।

তুমি ভাবছ, তোমাকে এ-সব কাহিনী শোনানো অন্যায়। আমার মনেও সেই সন্দেহ ছিল বলেই সেদিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের যত্নে আমার জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেলে, তখনও চুপ করে ছিলাম; কিন্তু সে চুপ করে থাকাটা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

রমা কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিল না। কহিল, তবে আজকেই বা বাড়িতে পেয়ে আমাকে অপমান করচেন কেন?

রমেশ কহিল, অপমান! কিছু না। এর মধ্যে মান-অপমানের কোন কথাই নেই। এ যাদের কথা হচ্ছে, সে রমাও কোন দিন তুমি ছিলে না, সে রমেশও আমি আর নেই। যাই হোক, শোন। সেদিন আমার কেন জানি নে, অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুসী কর, কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায় একদিন আমাকে ভালবাসতে, আজও তা একেবারে ভুলতে পারনি। তাই ভেবেছিলাম, কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছায়ায় বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব। তারপরে সে রাত্রে আকবরের নিজের মুখে যখন শুনতে পেলাম, তুমি নিজে—ওকি! বাইরে এত গোলমাল কিসের?

বাবু—

গোপাল সরকারের ত্রস্ত ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রমেশ ঘরের বাহিরে আসিতেই সে কহিল, বাবু, পুলিশের লোক ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে।

কেন ?

গোপালের ভয়ে ঠোঁট কাঁপিতেছিল ; কোনমতে কহিল, পরশু রাত্তিরে রাধানগরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।

রমেশ ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল, আর এক মুহূর্ত থেকো না রমা, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও ; খানাতল্লাসি করতে ছাড়বে না।

রমা নীলবর্ণ মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার কোন ভয় নেই তো ?

রমেশ কহিল, বলতে পারি নে। কত দূর কি দাঁড়িয়েচে সে তো এখনো জানি নে।

একবার রমার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, একবার তাহার মনে পড়িল, পুলিশে সেদিন তাহার নিজের অভিযোগ করা—তারপরই সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল বলিল, আমি যাব না।

রমেশ বিস্ময়ে মুহূর্তকাল অবাক্ থাকিয়া বলিল, ছি—এখানে থাকতে নেই রমা, শীগ্‌গির বেরিয়ে যাও, বলিয়া আর কোন কথা না শুনিয়া যতীনের হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া এই দুটি ভাই-বোনকে খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

তেরো

আজ দুই মাস হইতে চলিল, কয়েকজন ডাকাতির আসামীর সঙ্গে ভজুয়া হাজতে। সেদিন খানাতল্লাসিতে রমেশের বাড়ীতে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং ভৈরব আচার্য সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে রাত্রে ভজুয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মেয়ের পাত্র দেখিতে গিয়াছিল, তথাপি তাহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই।

বেণী আসিয়া কহিল, রমা, অনেক চাল ভেবে তবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে কি শত্রুকে সহজে জব্দ করা যায় ? সেদিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি হাতে করে বাড়ি চড়াও হয়ে মাছ আদায়

করতে এসেছিল, সে কথা যদি না তুমি থানায় লিখিয়ে রাখতে, আজ কি তা হলে ঐ ব্যাটাকে এমন কায়দায় পাওয়া যেত? অমনি ঐ সঙ্গে রমেশের নামটাও যদি আরও দু'কথা বাড়িয়ে গুছিয়ে লিখিয়ে দিতিস্ বোন—আমার কথাটায় তখন তোরা তো কেউ কান দিলিনে!

রমা এমনি ম্লান হইয়া উঠিল যে বেণী দেখিতে পাইয়া কহিল, না না, তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে না। আর তাই যদি হয় তাতেই বা কি! জমিদারী করতে গেলে কিছুতেই হটলে তো চলে না।

রমা কোন কথা কহিল না।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু তাকে তো সহজে ধরা চলে না! তবে সেও এবার কম চাল চালচে না দিদি! এই যে নূতন একটা ইস্কুল করেছে এ নিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। এমনিই তো মোচলমান প্রজারা জমিদার ব'লে মানতে চায় না, তার ওপর যদি লেখাপড়া শেখে তা হলে জমিদারী থাকা না-থাকা সমান হবে তা এখন থেকে বলে রাখছি।

জমিদারীর ভাল-মন্দ সম্বন্ধে রমা বরাবরই বেণীর পরামর্শমতই চলে; ইহাতে দু'জনের কোন মতভেদ পর্যন্ত হয় না। আজ প্রথম রমা তর্ক করিল। কহিল রমেশদা'র নিজের ক্ষতিও তো কম নয়?

বেণীর নিজের এ সম্বন্ধে খট্‌কা অল্প ছিল না। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা স্থির করিয়াছিল তাহাই কহিল, কি জান রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়—আমরা দু'জনে জব্দ হলেই ও খুসী। দেখছ না, এসে পর্যন্ত কি রকম টাকা ছড়াচ্ছে? চারিদিকে ছোটলোকদের মধ্যে ছোটবাবু, ছোটবাবু, একটা রব উঠে গেছে। যেন ঐ একটা মানুষ, আর আমরা দু'ঘর কিছুই নয়; কিন্তু বেশি দিন এ চলবে না। এই যে পুলিশের নজরে তাকে খাড়া করে দিয়েছ বোন, এতেই তাকে শেষ পর্যন্ত শেষ হতে হবে তা বলে দিচ্ছি,

বলিয়া বেণী মনে মনে একটু আশ্চর্য হইয়াই লক্ষ্য করিল, সংবাদটা শোনাইয়া তাহার কাছে যেরূপ উৎসাহ ও উত্তেজনা আশা করা গিয়াছিল তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। বরঞ্চ মনে হইল, সে হঠাৎ যেন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল, আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম রমেশদা জানতে পেরেছেন ?

বেণী কহিল, ঠিক জানি নে ; কিন্তু জানতে পারবেন। ভজুয়ার মোকদ্দমায় সব কথাই উঠবে।

রমা আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া ভিতরে ভিতরে সে যেন একটা বড় আঘাত সামলাইতে লাগিল—তাহার কেবলই মনে উঠিতে লাগিল, রমেশকে বিপদে ফেলিতে সে-ই যে সকলের অগ্রণী এই সংবাদটা আর রমেশের অগোচর রহিবে না। খানিক পরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল ওঁর নাম বুঝি সকলের মুখেই বড়'দা ?

বেণী কহিল, শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, শুনেছি ওর দেখাদেখি আরও পাঁচ-ছ'টা গ্রামে ইস্কুল করবার, রাস্তা তৈরী করবার আয়োজন হচ্ছে। আজকাল ছোটলোকেরা সবাই বলাবলি করছে, সাহেবদের দেশে গ্রামে গ্রামে একটা দুটো স্কুল আছে বলেই ওদের এত উন্নতি। রমেশ প্রচার করে দিয়েছে, যেখানে নূতন ইস্কুল হবে, সেখানেই ও দু'শ করে টাকা দেবে। ওর দাদামশায়ের যত টাকা পেয়েচে সমস্তই ও এইতে ব্যয় করবে। মোচলমানেরা তো ওকে একটা পীর পয়গম্বর বলে ঠিক করে বসে আছে।

রমার নিজের বুকের ভিতর এই কথাটা একবার বিদ্যুতের মত আলো করিয়া খেলিয়া গেল, যদি তাহার নিজের নামটাও এর সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারিত ; কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই দ্বিগুণ আঁধারে তাহার সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু আমিও অল্পে ছাড়ব না। সে যে আমাদের সমস্ত প্রজা এমনি করে বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে

আমরা চোখ মেলে মুখ বুজে দেখব, সে যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচায্যি এবার ভজুয়ার হয়ে সাক্ষী দিয়ে কি ক'রে তার মেয়ের বিয়ে দেয় সে আমি একবার ভাল করে দেখব। আরও একটা ফন্দি আছে—দেখি, গোবিন্দখুড়ো কি বলে! তার পর দেশে ডাকাতি তো লেগেই আছে। এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি, তো তার মনিবকে পুরতেও আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না।

রমা মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু রমেশদা সত্যিই তো আর চুরি-ডাকাতি করে বেড়ান না, বরং পরের ভালর জন্যই নিজস্ব সর্বস্ব দিচ্ছেন, সে কথা তো কারো কাছে চাপা থাকবে না। তারপর আমাদের নিজেদেরও তো গাঁয়ের মধ্যে মুখ বার করতে হবে?

বেণী হি হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল, তোর হ'ল কি বল্ তো বোন? তারপর নিজের মনে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল। রমা অনেকক্ষণ পর্যন্ত একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরে গিয়া মেঝের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেদিন তাহার একাদশী। খাবার হাঙ্গামা নাই মনে করিয়া সে যেন স্বস্তি বোধ করিল।

চৌদ্দ

বর্ষা শেষ হইয়া আগামী পূজার আনন্দ এবং ম্যালেরিয়া-ভীতি বাঙলার পল্লী-জননীর আকাশে-বাতাসে এবং আলোকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল, রমেশও জ্বরে পড়িল। গত বৎসর এই রাক্ষসীর আক্রমণকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু এ বৎসর আর পারিল না। তিন দিন জ্বরভোগের পর আজ সকালে উঠিয়া খুব খানিকটা কুইনিন্ গিলিয়া লইয়া জানালার বাহিরে পীতাভ রৌদ্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কিনা। এই তিন দিন মাত্র জ্বরভোগ করিয়াই সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, যা হোক কিছু একটা করিতেই হইবে। মানুষ হইয়া যদি নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিয়া প্রতি বৎসর মাসের পর মাস মানুষকে এই রোগভোগ করিতে দেয়, ভগবান তাকে ক্ষমা করিবেন না। রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল এমন অনেক গ্রাম পাশাপাশি আছে যেখানে একটা গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতেছে, অথচ আর একটায় ইহার প্রকোপ নাই বলিলেই হয়। ভাবিতেছিল, একটুকু সুস্থ হইলেই এইরূপ একটা গ্রাম সে নিজের চোখে গিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিবে এবং তাহার পরে নিজের কর্তব্য স্থির করিবে। কারণ তাহার নিশ্চিন্ত ধারণা জন্মিয়াছিল, এই ম্যালেরিয়াহীন গ্রামগুলির জল-নিকাশের স্বাভাবিক সুবিধা কিছু আছেই যাহা এমনি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ও চেষ্টা করিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে লোকে দেখিতে পাইবে। অন্ততঃ তাহার নিতান্ত অনুরক্ত পিরপুরের মুসলমান প্রজারা চক্ষু মেলিবেই। তাহার ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষা এতদিন পরে এমন একটা মহৎ কাজে লাগাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সে মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ছোটবাবু?

অকস্মাৎ কান্নার সুরে আহ্বান শুনিয়া রমেশ মহাবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ভৈরব আচার্য ঘরের মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার সাত-আট বৎসরের একটি কন্যা সঙ্গে আসিয়াছিল; বাপের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার চীৎকারে ঘর ভরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বাড়ির লোক যে যেখানে ছিল দোরগোড়ায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। রমেশ কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এই লোকটার কে মরিল, কি সর্বনাশ হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন করিয়া কান্না থামাইবে কিছু যেন ঠাহর পাইল না।

ব্যাপারটা এই—ভৈরবের সাক্ষ্যে ভজুয়া নিষ্কৃতি পাইলে তাহাকে পুলিশের সন্দেহ-দৃষ্টির বহির্ভূত করিতে রমেশ তাহাকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আসামী পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু সাক্ষী ফাঁদে পড়িল। কেমন করিয়া যেন বাতাসে নিজের বিপদের বার্তা পাইয়া ভৈরব কাল সদরে গিয়া সন্ধান লইয়া অবগত হইয়াছে যে, দিন পাঁচ-ছয় পূর্বে বেণীর খুড়শ্বশুর রাধানগরের সনৎ মুখুজ্যে ভৈরবের নামে সুদে-আসলে এগার-শ ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিগ্রী করিয়াছে এবং তাহার বাস্তু-ভিটা ক্রোক করিয়া নীলাম করিয়া লইয়াছে। ইহা একতরফা ডিগ্রী নহে। যথারীতি শমন বাহির হইয়াছে; কে তাহা ভৈরবের নামে দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্য দিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুল-জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্বলের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে। অথচ সরকারের আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের উপায় সহজ নহে। আইনমত সমস্ত মিথ্যা-ঋণ বিচারালয়ে গচ্ছিত না করিয়া

কথাটি কহিবার জো নাই। মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। কিন্তু এত টাকা দরিদ্র ভৈরব কোথায় পাইবে যে তাহা জমা দিয়া এই মহা-অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। সুতরাং রাজার আইন, আদালত, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত মাথার উপর থাকিলেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশব্দে মরিতে হইবে।

রমেশ আরও কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া সহসা যেন ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত টাকাটার একখানা চেক লিখিয়া গোপাল সরকারের হাতে দিয়া কহিল, আপনি সমস্ত বিষয়ে নিজে ভাল ক'রে জেনে টাকাটা জমা দিয়ে দেবেন এবং যেমন ক'রে হোক পুনর্বিচারের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে আসবেন। এমন ভয়ংকর অত্যাচার করবার সাহস তাদের আব যেন কোনদিন না হয়।

চেক হাতে করিয়া গোপাল সরকাব ও ভৈরব উভয়ে কিছুক্ষণ যেন বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। রমেশ পুনর্বার যখন নিজের বক্তব্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া কহিল এবং সে যে তামাসা করিতেছে না তাহা নিঃসন্দেহে যখন বুঝা গেল, অকস্মাৎ ভৈরব ছুটিয়া আসিয়া পাগলের ন্যায় রমেশের দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া চেঁচাইয়া আশীর্বাদ করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, রমেশের অপেক্ষা অল্প বলশালী লোকের পক্ষে নিজেকে মুক্ত করিয়া লওয়া সে দিন একটা কঠিন কাজ হইত।

তাবপর মাস-খানেক গত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মনে মনে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রমেশ এই একটা মাস তাহার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া এমনি উৎসাহের সহিত নানা স্থানে মাপ-জোখ করিয়া ফিরিতেছিল যে, আগানী কালই যে ভৈরবের মকদ্দমা তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ সে কথা মনে পড়িয়া গেল রসুনচৌকির সানাইয়ের সুরে। চাকরের কাছে সংবাদ পাইয়া রমেশ আশ্চর্য হইয়া গেল যে, আজ ভৈরব আচার্যের দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন।

অথচ সে তো কিছুই জানে না! শুনিতে পাইল ভৈরব আয়োজন মন্দ করে নাই। গ্রামসুদ্ধ সমস্ত লোককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে; কিন্তু রমেশকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল কিনা সে খবর বাড়িতে কেহই দিতে পারিল না। শুধু তাহাই নয়। তাহার স্মরণ হইল এত বড় একটা মামলা ভৈরবের মাথার উপর আসন্ন হইয়া থাকা সত্ত্বেও সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবাব সাক্ষাৎ পর্যন্ত করিতে আসে নাই। ব্যাপার কি; কিন্তু এমন কথা তাহার মনে উদয় হইয়াও হইল না যে সংসারেব সমস্ত লোকের মধ্যে ভৈরব তাহাকেই বাদ দিতে পারে। তাই নিজের এই অদ্ভুত আশঙ্কায় নিজেই লজ্জিত হইয়া রমেশ তখনই একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া একেবারে সোজা আচার্য-বাড়ির উদ্দেশে বাহিব হইয়া পড়িল। খাওয়ানো তখন প্রায় সামাপ্ত হইয়া গিয়াছিল—বেশী লোক আব ছিল না। পাড়ার মুরুব্বিরা তখন যাই-যাই করিতেছিলেন এবং ধর্মদাস হরিহর রায়কে আরও একটুখানি বসিতে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। গোবিন্দ গাঙ্গুলী একটুখানি সরিয়া বসিয়া কে একজন চাষাব ছেলের সহিত নিরিবিলি আলাপে রত ছিলেন। এমনি সময়ে রমেশ দুঃস্বপ্নের মত একেবারে প্রাঙ্গণের বুকের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ইহাদের মুখও যেন এক মুহূর্তে মসীবর্ণ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষীয় এই দুইটা লোককে এই বাটীতেই এমনভাবে যোগ দিতে দেখিয়া রমেশের মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। কেহই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে অগ্রসর হইল না—এমন কি একটা কথা পর্যন্ত কহিল না। ভৈরব নিজে সেখানে ছিল না। খানিক পরে সে বাটীর ভিতর হইতে কি একটা কাজে—বলি গোবিন্দদা, বলিয়া বাহির হইয়াই উঠানের মাঝখানে যেন ভূত দেখিতে পাইল এবং পরক্ষণেই ছুটিয়া বাটীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রমেশ শুষ্কমুখে একাকী যখন বাহির হইয়া আসিল তখন প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাহার মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। পিছনে ডাক শুনিল, বাবা, রমেশ!

ফিরিয়া দেখিল দীনু হন্‌হন্‌ করিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, চল বাবা বাড়ি চল।

রমেশ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল মাত্র।

চলিতে চলিতে দীনু বলিতে লাগিল, তুমি ওর যে উপকার করেছ বাবা, সে ওর বাপ-মা করত না। এ কথা সবাই জানে, কিন্তু উপায় তো নেই। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আমাদের সকলেরই ঘর করতে হয়; তাই তোমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলে—বুঝলে না বাবা—ভৈরবকেও নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না—তোমরা সব আজকালকার শহরের ছেলে—জাত-টাত তেমন তো কিছু মানতে চাও না—তাইতেই বুঝলেই না বাবা—দু'দিন পরে ওর ছোট মেয়েটিও প্রায় বারো বছরের হ'ল তো—পার করতে হবে তো বাবা? আমাদের সমাজের কথা জান সবই বাবা—বুঝলে না বাবা—

রমেশ অধীরভাবে কহিল, আজ্ঞে হাঁ, বুঝেছি। বলিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল। গ্রামের লোক তাহাকে একঘরে করিয়াছে তাহা বুঝিতে তাহার আর বাকি রহিল না। নিজের ঘরের মধ্যে আসিয়া সে একটা চৌকির উপর বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এ অকৃতজ্ঞ জাতের এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে! এত বড় নিষ্ঠুর অপমান কি ভগবান তুমিই ক্ষমা করতে পারবে?

পনের

এমনি একটা আশঙ্কা যে রমেশের মাথায় একেবারেই আসে নাই তাহা নহে। তথাপি পরদিন সন্ধ্যার সময় গোপাল সরকার সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সত্য সত্যই জানাইল যে, ভৈরব আচার্য তাহাদের মাথার উপরেই কাঁঠাল ভাঙিয়া ভক্ষণ করিয়াছে, অর্থাৎ সে মকদ্দমায় হাজির হয় নাই এবং তাহা এক-তরফা ডিস্‌মিস্‌ হইয়া গিয়া তাহাদের প্রদত্ত জমার টাকাটা বেণী প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে, তখন এক মুহূর্তেই ক্রোধে রমেশের পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সেদিন ইহাদের জাল ও জুয়াচুরি দমন করিতে যে মিথ্যা ঋণ সে ভৈরবের হইয়া জমা দিয়াছিল, মহা-পাপিষ্ঠ ভৈরব তাহার দ্বারাই নিজের মাথা বাঁচাইয়া লইয়া পুনরায় বেণীর সহিতই সখ্য স্থাপন করিয়াছে। তাহার এই অকৃতজ্ঞতা কালকের অপমানকেও বহু ঊর্ধ্বে ছাপাইয়া আজ রমেশের মাথার ভিতর জ্বলিতে লাগিল। রমেশ যেমন ছিল তেমনি খাড়া হইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

ভৈরবের বহির্বাটীতে ঢুকিয়া দেখিল কেহ নাই। সে ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন ভৈরবের বৌ সন্ধ্যাদীপ হাতে উঠানের তুলসীতলায় আসিতেছিলেন, অকস্মাৎ রমেশকে সুমুখে দেখিয়া একেবারে জড়সড় হইয়া গেলেন। যে কখনও আসে না, আজ কেন সে আসিয়াছে তাহা মনে করিতেই ভয়ে তাঁহার হৃৎপিণ্ড কণ্ঠের মাঝে ঠেলিয়া আসিল।

রমেশ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, আচার্যিমশাই কই?

ভৈরবের বৌ চাপা-গলায় যাহা বলিলেন তাহা শোনা গেল না বটে, কিন্তু বোঝা গেল তিনি ঘরে নাই। রমেশের গায়ে একটা জামা অবধি ছিল না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় তাহার মুখও ভাল

দেখা যাইতেছিল না। এমন সময়ে ভৈরবের বড় মেয়ে লক্ষ্মী ছেলে কোলে গৃহের বাহির হইয়াই এই অপরিচিত লোকটাকে দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, ও কে মা ?

তাহার মা-ও পরিচয় দিতে পারিলেন না, রমেশও কথা কহিল না।

লক্ষ্মী ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া ডাকিল, বাবা কে একটা লোক উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে, কথা কয় না।

কে রে ? বলিয়া সাড়া দিয়া তাহার পিতা ঘরের বাহিরে আসিয়াই একেবারে কাঠ হইয়া গেল। সন্ধ্যার ম্লান-ছায়াতেও সেই দীর্ঘ, ঋজু-দেহ চিনিতে তাহার বাকি রহিল না।

রমেশ কঠোর স্বরে ডাকিল—নেমে আসুন, বলিয়া, তৎক্ষণাৎ নিজেই উঠিয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল, কেন এমন কাজ করলেন ?

ভৈরব কাঁদিয়া উঠিল, মেরে ফেললে রে লক্ষ্মী, বেণীবাবুকে খবর দে।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িসুদ্ধ ছেলে-মেয়ে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং চোখের পলকে সন্ধ্যার নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া বহুকণ্ঠের গগনভেদী কান্নার রোলে সমস্ত পাড়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

রমেশ তাহাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া কহিল, চুপ। বলুন, কেন এ কাজ করলেন ?

ভৈরব উত্তর দিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া একভাবে চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইতে লাগিল এবং নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য টানা-হেঁচড়া করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার মেয়ে-পুরুষে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং তামাসা দেখিতে আরও বহু লোক ভিড় করিয়া ভিতরে ঢুকিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল ; কিন্তু রাগে অন্ধ রমেশ সেদিকে লক্ষ্য করিল না। শত চক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইয়া সে

উন্মত্তের মত ভৈরবকে ধরিয়া একভাবে নাড়া দিতে লাগিল। একে রমেশের গায়ের জোর অতিরঞ্জিত হইয়া প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছিল,

তাহাতে তাহার চোখের পানে চাহিয়া এই এক-বাড়ি লোকের মধ্যে এমন সাহস কাহারও হইল না যে হতভাগ্য ভৈরবকে ছাড়াইয়া দেয়। গোবিন্দ বাড়ি ঢুকিয়াই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। বেণী উঁকি মারিয়াই সরিতেছিল, ভৈরব দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বড়বাবু—বড়বাবু—

বড়বাবু কিন্তু কর্ণপাতও করিল না, চোখের নিমিষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

সহসা জনতার মধ্যে একটুখানি পথের মত হইল এবং পরক্ষণেই রমা দ্রুতপদে আসিয়া রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, হয়েছে—এবার ছেড়ে দাও।

রমেশ তাহার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, কেন ?

রমা দাঁতে দাঁত চাঁপিয়া অস্ফুট-ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, এত লোকের মাঝখানে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই !

রমেশ, উঠান-ভরা লোকের পানে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ ভৈরবের হাত ছাড়িয়া দিল।

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, বাড়ি যাও।

রমেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ এ যেন একটা ভোজবাজি হইয়া গেল ; কিন্তু সে চলিয়া গেলে রমার প্রতি তাহার এই অতিশয় বাধ্যতায় সবাই যেন কি একরকম মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল এবং এমন জিনিসটা এত আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়া এভাবে শেষ হইয়া যাওয়াটা পাড়ার লোকের কাহারও যেন মনঃপূত হইল না।

লোকজন চলিয়া গেল। গোবিন্দ গাঙ্গুলী আত্মপ্রকাশ করিয়া একটা আঙুল তুলিয়া মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া কহিল, বাড়ি চড়াও হয়ে যে আধ-মরা ক'রে দিয়ে গেল, এর কি করবে সেই পরামর্শ করো।

এই ঘটনার কারণ ও ফল যত বড় এবং যাহাই হোক, নিজের কদাকার অসংযমে রমেশের শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ দুইটা দিন এমনি সংকুচিত হইয়া রহিল যে, সে বাড়ির বাহির হইতে পারিল না।

কিন্তু লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ তাহার ঘটিল না। সেদিন বিকালে পিরপুরের মুসলমান প্রজারা তাহাদের পঞ্চায়েতের বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল। এ বৈঠকের আয়োজন রমেশ নিজেই কিছুদিন পূর্বে করিয়া আসিয়াছিল। সেই-মত তাহারা আজ একত্র হইয়া ছোটবাবুর জন্যই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে বলিয়া যখন সংবাদ দিয়া গেল, তখন তাহাকে যাইবার জন্য উঠিতে হইল।

আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন ?

রমেশ চমকাইয়া উঠিল—এ কি রমা ? এমন সময়ে যে !

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমা প্রশ্ন করিল, আপনার শরীর এখন কেমন আছে ?

ভাল নয়। আবার রোজ রাত্রেই জ্বর হচ্ছে।

তা হ'লে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে তো ভাল হয়।

রমেশ হাসিয়া কহিল, ভাল তো হয় জানি, কিন্তু যাই কি ক'রে ?

তাহার হাসি দেখিয়া রমা বিরক্ত হইল। কহিল, আপনি বলবেন আপনার অনেক কাজ, কিন্তু এমন কি কাজ আছে যা নিজের শরীরের চেয়েও বড় ?

রমেশ পূর্বের মতই হাসিয়া জবাব দিল, নিজের দেহটা যে ছোট জিনিস তা আমি বলি নে ; কিন্তু এমন কাজ মানুষের আছে যা এই দেহটার চেয়ে অনেক বড়—কিন্তু সে তো তুমি বুঝবে না রমা।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি বুঝতেও চাই নে, কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকার মশাইকে ব'লে দিয়ে যান আমি তাঁর কাজকর্ম দেখব।

রমেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, তুমি আমার কাজকর্ম দেখবে ? কিন্তু—

কিন্তু কি ?

কিন্তু কি জানো রমা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব কি ?

রমা অসংকোচে তৎক্ষণাৎ কহিল, ইতরে পারে না কিন্তু আপনি পারবেন।

তাহার দৃঢ়কণ্ঠের এই অভাবনীয় উক্তিতে রমেশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষণেক মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, ভাববার সময় নেই, আজই আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে—বলিতে বলিতেই

সে স্পষ্ট অনুভব করিল রমেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ অকস্মাৎ এমন করিয়া না পলাইলে বিপদ যে কি ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। রমেশ ঠিকই অনুমান করিল ; কিন্তু আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল, ভাল, তাই যদি যাই তাতে তোমার লাভ কি ? আমাকে বিপদে ফেলতে তুমি নিজেও তো কম চেষ্টা করনি, যে আজ আর একটা বিপদে সতর্ক করতে এসেছে ! সে সব কাণ্ড এত পুরনো হয়নি যে তোমার মনে নেই। বরং খুলে বল, আমি গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়, আমি চ'লে যেতে হয়ত রাজি হতেও পারি, বলিয়া সে যে-উত্তরের প্রত্যাশায় রমার অস্পষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল তাহা পাইল না।

কত বড় অভিমান যে রমার বুক জুড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তাহাও জানা গেল না। রমেশের নিষ্ঠুর বিদ্রূপের আঘাতে মুখ যে তাহার কিরূপ বিবর্ণ হইয়া রহিল, তাহাও অন্ধকারে লক্ষ্য হইল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রমা আপনাকে সামলাইয়া লইল। পরে কহিল, আচ্ছা, খুলেই বলছি। আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ শুষ্ক হইয়া কহিল, এই ! কিন্তু সাক্ষী না দিলে ?

রমা একটুখানি থামিয়া কহিল, না দিলে ? না দিলে দু'দিন পরে আমার মহামায়ার পূজোয় কেউ আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না—আমার বার-ব্রত—এরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা স্মরণমাত্র রমা শিহরিয়া উঠিল।

রমেশের আর না শুনিলেও চলিত কিন্তু থাকিতে পারিল না। কহিল তারপরে ?

রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল, তারও পরে ? না তুমি যাও—আমি মিনতি করছি, রমেশদা, আমাকে সব দিকে নষ্ট করো না ; তুমি যাও—যাও এ দেশ থেকে।

রমেশ গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আচ্ছা তাই হবে।

কিন্তু আজ আর সময় নেই! কারণ আমার পালাবার হেতুটা যত বড়ই তোমার কাছে হোক আজ রাত্রিটা আমার কাছে তার চেয়েও গুরুতর। তোমার দাসীকে ডাকো, বাড়ি যাও। আমাকে এখনি বাইরে যেতে হবে।

ষোল

প্রতি বৎসর রমা ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিত এবং প্রথম পূজার দিনেই গ্রামের সমস্ত চাষাভূষা প্রভৃতিকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণ-বাড়িতে মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য এমন হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত যে রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত ভাঁড়ে-পাতায় এঁটোতে-কাঁটাতে বাড়িতে পা ফেলিবার জায়গা থাকিত না। শুধু হিন্দু নয়, পিরপুরের প্রজারাও ভিড় করিতে ছাড়িত না। এবারেও সে নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আয়োজনের ত্রুটি করে নাই। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা ও পূজার সাজ-সরঞ্জাম। নীচে উৎসবের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সপ্তমী পুজা যথাসময়ে সমাধা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়াইয়া তাহাও শেষ হইতে বসিয়াছে। আকাশে সপ্তমীর খণ্ড-চন্দ্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু মুখুজ্যে-বাড়ির মস্ত উঠান জনকয়েক ভদ্রলোক ব্যতীত একেবারে শূন্য খাঁ-খাঁ করিতেছে। বাড়ির ভিতরে অন্নের স্তূপ ক্রমে জমাট বাধিয়া কঠিন হইতে লাগিল, ব্যঞ্জনের রাশি শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন চাষাও মায়ের প্রসাদ পাইতে বাড়িতে পা দিল না।

ঈস্! এত আহার্য-পেয় নষ্ট ক'রে দিচ্ছে দেশের ছোটলোকদের দল? এত বড় স্পর্ধা! বেণী হুঁকা হাতে একবার ভিতরে একবার বাহিরে হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিল—ব্যাটাদের শেখাব—চাল কেটে তুলে দেব—এমন করব, তেমন করব, ইত্যাদি।

গোবিন্দ, ধর্মদাস, হালদার প্রভৃতি এঁরা রুষ্টমুখে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আন্দাজ করিতে লাগিলেন, কোন ব্যাটার কারসাজিতে এই কাণ্ডটা ঘটিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানে একমত হইয়াছে, এও তো বড় আশ্চর্য !

বেণী রাগিয়া কহিল, এ বড় সর্বনেশে কথা ! একবার যখন জানব এর মুলে কে—বলিয়া দুই হাতের নখ এক করিয়া কহিল, তখন এই এমনি ক'রে ছিঁড়ে ফেলব।

রমা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বেণী কহিতে লাগিল, হারাম-জাদা ব্যাটারা এ বুঝিস্ নে যে, যার জোরে তোরা জোর করিস্ সেই রমেশ নিজে যে জেলের ঘানি টানছে। তোদের মারতে কতটুকু সময় লাগে ?

রমা কোন কথা কহিল না। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল তাহা শেষ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

দেড় মাস হইল রমেশ অবৈধ প্রবেশ করিয়া ভৈরবকে ছুরি মারার অপরাধে জেল খাটিতেছে। মকদ্দমায় বাদীর পক্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই—নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি করিয়া পূর্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন এ-প্রকার অপরাধ আসামীর পক্ষে খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। এমন কি, সে ডাকাতি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট কিনা সে বিষয়েও তাহার যথেষ্ট সংশয় আছে। থানার কেতাব হইতেও তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, ঠিক এই ধরণের অপরাধ সে পূর্বেও করিয়াছে এবং আরও অনেক প্রকার সন্দেহজনক ব্যাপার তাহার নামের সহিত জড়িত আছে। ভবিষ্যতে পুলিশ যেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে, তিনি এ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। বেশী সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, তবে রমাকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। সে কহিয়া-ছিল, রমেশ বাড়ি ঢুকিয়া আচার্য মহাশয়কে মারিতে আসিয়াছিল

তাহা সে জানে; কিন্তু ছুরি মারিয়াছিল কিনা জানে না, হাতে তাহার ছুরি ছিল কিনা তাহাও তাহার স্মরণ হয় না।

কিন্তু এই কি সত্য? জেলার বিচারালয়ে হলফ্ করিয়া রমা এই সত্য বলিয়া আসিল, কিন্তু যে বিচারালয়ে হলফ্ করার প্রথা নাই, সেখানে সে কি জবাব দিবে? তাহার অপেক্ষা কে অধিক নিঃসংশয়ে জানিত রমেশ ছুরিও মারে নাই, হাতে তাহার অস্ত্র থাকা তো দূরের কথা, একটা তৃণ পর্যন্ত ছিল না। সে আদালতে ও-কথা তো কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিবে না—সে কি স্মরণ করিতে পারে এবং কি পারে না; কিন্তু এখানকার আদালতে সত্য বলিবার যে তাহার এতটুকুও পথ ছিল না! বেণী প্রভৃতির হাত-ধরা পল্লী-সমাজ সত্য চাহে নাই। সুতরাং সত্যের মূল্যে তাহাকে যে মিথ্যার অপবাদের গাঢ় কালি নিজের মুখময় মাখিয়া এই সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে—এমন তো অনেককেই হইয়াছে—এ কথা সে যে নিঃসংশয়ে জানিত। তাছাড়া এতবড় গুরুদণ্ডের কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। বড় জোর দু'শ-একশ টাকা জরিমানা হইবে ইহাই সে জানিত। বরঞ্চ বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও রমেশ যখন তাহার কাজ ছাড়িয়া কোনমতেই পলাইতে স্বীকার করে নাই, তখন রাগ করিয়া রমা মনে মনে এ কামনাও করিয়াছিল, হোক জরিমানা। একবার শিক্ষা হইয়া যাক; কিন্তু সে শিক্ষা যে এমন করিয়া হইবে, রমেশের রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়াও বিচারকের দয়া হইবে না—একেবারে ছয় মাস সশ্রম কারবাসের হুকুম করিয়া দিবে—তাহা সে ভাবে নাই। সেই সময়ে রমা নিজে রমেশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে নাই। পরের মুখে শুনিয়াছিল, রমেশ একদৃষ্টে তাহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল এবং কিছুতেই তাহাকে জেরা করিতে দেয় নাই এবং জেলের হুকুম হইয়া গেলে গোপাল সরকারের প্রার্থনার উত্তরে মাথা নাড়িয়া কহিয়াছিল, না! ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে সারাজীবন কারারুদ্ধ করিবার হুকুম দিলেও

আমি আপিল ক'রে খালাস পেতে চাই নে। বোধ করি জেল এর চেয়ে ভাল।

বৃদ্ধ সনাতন হাজরা-বাড়ির সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ডাকাডাক, অনুনয়-বিনয়, শেষকালে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বেণীবাবুর সামনে হাজির করিয়া দিল। বেণী গরম হইয়া কহিল, এত দেমাক কবে থেকে হ'ল রে সনাতন? বলি, তোদের ঘাড়ে কি আজকাল আর একটা ক'রে মাথা গজিয়েছে নাকি রে?

সনাতন কহিল, দুটো ক'রে মাথা আর কার থাকে বড়বাবু? আপনাদের থাকে না তো আমাদের মত গরীবের!

কি বললি রে! বলিয়া হাঁক দিয়া বেণী ক্রোধে নির্বাক্ হইয়া গেল; ইহারই সর্বস্ব যেদিন বেণীর হাতে বাঁধা ছিল, তখন এই সনাতন দু'বেলা আসিয়া বড়বাবুর পদলেহন করিয়া যাইত—আজ তাহারই মুখে এই কথা!

গোবিন্দ রসান দিয়া কহিল, তোদের বুকের পাটা শুধু দেখছি আমরা! মায়ের প্রসাদ খেতেও কেউ তোরা এলিনি, বলি, কেন বল্ তো রে?

বুড়ো একটুখানি হাসিয়া কহিল, আর বুকের পাটা! যা কববার সে তো আপনারা আমার করেছেন। সে যাক, কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন আর যাই বলুন, কোন কৈবর্তই আর বামুন-বাড়িতে পাত পাতবে না! এত পাপ যে মা বসুমতী কেমন ক'রে সইছেন তাই আমরা কেবল বলাবলি করি, বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সনাতন রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, একটু সাবধানে থেকো দিদিঠাকরুণ, পিরপুরের মোছলমান ছোঁড়ারা একেবারে ক্ষেপে রয়েছে। ছোটবাবু ফিরে এলে যে কি কাণ্ড হবে তা মা দুর্গাই জানেন। এর মধ্যেই দু-তিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ির চার পাশে ঘুরে-ফিরে গেছে—সামনে পায়নি তাই রক্ষে, বলিয়া সে বেণীর দিকে চাহিল। চক্ষের নিমেষে বেণীর ক্রুদ্ধ মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

সনাতন প্রতিমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মিথ্যে ব'লে আর নরকে যাব কেন দিদিঠাকরুণ, তাই বটে! মোছলমানদের রাগটাই সবচেয়ে বেশি। তারা ছোটবাবুকে হিঁদুদের পয়গম্বর মনে করে। তার সাক্ষী দেখুন আপনারা—জাফর আলি, আঙ্গুল দিয়ে যার জল গলে না, সে ছোটবাবুর জেলের দিন তাদের ইস্কুলের জন্যে একটি হাজার টাকা দান করেছে। শুনি, মসজিদে তাঁর নাম ক'রে নাকি নেমাজ পড়া পর্যন্ত হয়।

রমার শুষ্ক ম্লান মুখখানি অব্যক্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া প্রদীপ্ত নির্নিমেষ চোখে সনাতনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বেণী অকস্মাৎ সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোকে একবার দারোগার কাছে গিয়ে বলতে হবে সনাতন! তুই যা চাইবি তাই তোকে দেবো, দু'বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস্ তো তাই পাবি, ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্বি করছি সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ্।

সনাতন বিস্মিতের মত কিছুক্ষণ বেণীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আর ক'টা দিনই বা বাঁচব বড়বাবু। লোভে প'ড়ে যদি এ কাজ করি, মরলে আমাকে তোলা চুলোয় যাক পা দিয়ে কেউ ছোঁবে না। সে দিন-কাল আর নেই বড়বাবু, সে দিন-কাল আর নেই! ছোটবাবু সব উল্‌টে দিয়ে গেছে।

গোবিন্দ কহিল, বামুনের কথা তা'হলে রাখবি নে বল্?

সনাতন মাথা নাড়িয়া বলিল, না। বললে তুমি রাগ করবে গাঙ্গুলীমশাই, কিন্তু সেদিন পিরপুরের নতুন ইস্কুল-ঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছ-কতক সুতো ঝোলানো থাকলেই বামুন হয় না। আমি তো আর আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। যা করে তুমি বেড়াও সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি দিদিঠাকরুণ, তুমিই বল দেখি?

রমা নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল।

সনাতন চলিয়া গেল, বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও কথা কহিবার প্রবৃত্তি রহিল না। রমা উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতে বেণী বলিয়া উঠিল, ব্যাপার শুনলে রমা ?

রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না। হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল, ব্যাটা ভৈরবের জন্যই এত কাণ্ড। আর তুমি যদি না যাবে সেখানে, না তাকে ছাড়িয়ে দেবে, এ সব কিছু হ'ত না। তুমি তো হাসবেই রমা, মেয়েমানুষ, বাড়ির বার হতে তো হয় না, কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল তো ? সত্যিই যদি একদিন আমার মাথাটা ফাটিয়ে দেয় ? মেয়েমানুষের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়, বলিয়া বেণী ভয়ে, ক্রোধে, জ্বালায় মুখখানা কি এক রকম করিয়া বসিয়া রহিল।

রমা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বেণীকে সে ভালমতেই চিনিত, কিন্তু এত বড় নির্লজ্জ অভিযোগ সে তাহার কাছেও প্রত্যাশা করিতে পারিত না। কোন উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল। বেণী তখন হাঁক-ডাক করিয়া গোটা-দুই আলো এবং পাঁচ-ছয় জন লোক সঙ্গে করিয়া আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে প্রস্থান করিল।

সতের

বিশ্বেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া অশ্রুভরা রোদনের কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আজ কেমন আছিস্ মা রমা ?

রমা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আজ ভাল আছি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী তাহার শিয়রে আসিয়া বসিলেন এবং চুপচাপ মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আজ তিন মাসকাল রমা শয্যাগত, বুক জুড়িয়া কাসি এবং ম্যালেরিয়ার বিষে শরীর জর-জর!

তিনি ধীরে ধীরে ডাকিলেন, রমা!

কেন জ্যাঠাইমা ?

আমি তো তোর মায়ের মত রমা—

রমা বাধা দিয়া বলিল, মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমি তো আমার মা!

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া রমার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, তবে সত্যি ক'রে বল্ দেখি মা, তোর কি হয়েছে ?

অসুখ করেছে জ্যাঠাইমা!

বিশ্বশ্বরী লক্ষ্য করিলেন, তাহার এমন পাণ্ডুর মুখখানি যেন পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল।

তখন গভীর স্নেহে তাহার রুক্ষ চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, সে তো এই দুটো চামড়ার চোখেই দেখতে পাই মা! যা এতে ধরা যায় না, তেমন কিছু যদি থাকে এ সময়ে মায়ের কাছে লুকোস্ নে রমা! লুকালে তো অসুখ সারবে না মা ?

জানালার বাহিরে প্রভাত-রৌদ্র তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই এবং মৃদু-মন্দ বাতাসে শীতের আভাস দিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমা চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, বড়দা কেমন আছেন জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, ভাল আছে। মাথার ঘা সারাতে এখনও বিলম্ব হবে বটে, কিন্তু পাঁচ-ছয় দিনেব মধ্যে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসতে পারবে।

রমার মুখে বেদনার চিহ্ন অনুভব করিয়া বলিলেন, দুঃখ ক'রো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে, বলিয়া তিনি বমার মুখে বিস্ময়ের আভাস অনুভব করিয়া কহিলেন, ভাবছ, মা হয়ে সন্তানের এত বড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কিকরে বলছি? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলছি মা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেয়েছি কি আনন্দ বেশি পেয়েছি তা বলতে পারি নে। কেন না, আমি জানি যারা অধর্মকে ভয় করে না, লজ্জার ভয় যাদেব নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশি থাকে, তা হ'লে সংসাব ছারখার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই কলুর ছেলে বেণীর যে মঙ্গল ক'রে দিয়ে গেল, পৃথিবীতে কোন আত্মীয়-বন্ধুই ওর সে ভাল করতে পারত না। কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ্ বদলানো যায় না, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

বমা জিজ্ঞাসা কবিল, বাড়িতে তখন কি কেউ ছিল না?

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, থাকবে না কেন, সবাই ছিল; কিন্তু সে তো খামকা মেরে বসেনি, নিজে জেলে যাবে ব'লে ঠিক ক'রে তবে তেল বেচতে এসেছিল। তার নিজেব রাগ একটুও ছিল না মা, তাই তার বাঁকের এক ঘায়েই বেণী যখন অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল তখন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল—আর আঘাত কবলে না। তা'ছাড়া সে বলে গেছে এর পরেও বেণী সাবধান না হলে সে নিজে আর কখনো ফিরুক না ফিরুক, এই মারই তার শেষ মার নয়।

রমা আস্তে আস্তে বলিল, তার মানে আরও লোক পিছনে আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ছোটলোকদের এত সাহস তো কোন দিন ছিল না জ্যাঠাইমা, কোথা থেকে এ তারা পেলে?

বিশ্বেশ্বরী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সে কি তুই নিজে জানিস্ নে

মা, কে দেশের এই ছোটলোকদের বুক এমন করে ভ'রে দিয়ে গেছে ? আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না রমা। তাকে জোর করে নেবালেও সে আশে-পাশের জিনিস তাতিয়ে দিয়ে যায়। সে আবার ফিবে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেখানে খুসী সেখানে থাক, বেণীর কথা মনে ক'রে আমি কোন দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলব না।

রমা নিজেব ব্যবহার স্মরণ করিয়া নীরবে নিঃশ্বাস ফেলিল। বিশ্বেশ্বরী বলিতে লাগিলেন, এর থেকে আমারও চোখ ফুটেচে রমা, ভাল করব বললেই ভাল করা যায় না। গোড়ার অনেকগুলো ছোট-বড় সিঁড়ি পেরোবাব ধৈর্য থাকা চাই। তাছাড়া তো জানি না মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত—সে কাজ এমন কঠিন! আগে যে মিলতে হয় সকলেব সঙ্গে, ভালতে মন্দতে এক না হতে পারলে যে কিছুতেই ভাল কবা যায় না—সে কথা তো আমি ভাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার, মস্ত জোব, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে এসে দাঁড়াল যে, শেষ পর্যন্ত কেউ তার নাগালই পেলে না, কিন্তু সে তো আমার চোখে পড়ল না মা, আমি তাকে যেতেও দিলাম না, রাখতেও পারলাম না।

তাঁহার হাতখানি রমা নীরবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ধীরে ধীরে বড় করুণকণ্ঠে কহিল আচ্ছা জ্যাঠাইমা, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে নিরপরাধীকে দণ্ডভোগ করানোর শাস্তি কি ?

বিশ্বেশ্বরী জানালাব বাহিরে চাহিয়া রমার বিপর্যস্ত রুক্ষ চুলেব রাশির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, তাহাব নিমীলিত দুই চোখেব প্রান্ত বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, কিন্তু তোমার তো হাত ছিল না মা! মেয়েমানুষের এতবড় কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে যে কাপুরুষেরা তোমার ওপর এই অত্যাচার করেছে, সমস্ত গুরুদণ্ডই তাদেব। তোমাকে তো এর একটি কিছুই বইতে হবে না মা, বলিয়া তিনি আবার তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তাহার একটুমাত্র আশ্বাসেই বমাব রুদ্ধ-অশ্রু

এইবার প্রস্রবণের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে কহিল, কিন্তু তাঁরা যে তাঁর শত্রু! তাঁরা বলেন, শত্রুকে যেমন করে হোক নিপাত করতে দোষ নেই; কিন্তু আমার তো সে কৈফিয়ৎ নেই জ্যাঠাইমা!

তোমারই বা কেন নেই মা? প্রশ্ন করিয়া তিনি দৃষ্টি অনবত করিতেই অকস্মাৎ তাঁহার চোখের উপর যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। যে সংশয় মুখ ঢাকিয়া একদিন তাঁহার মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিয়া বেড়াইত, সে যেন তাহার মুখোস ফেলিয়া দিয়া একেবারে সোজা হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইল। আজ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষণকালের জন্য বিশ্বেশ্বরী বেদনায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রমার হৃদয়ের ব্যথা আজ তাঁহার অগোচর রহিল না।

রমা চোখ বুজিয়াছিল, বিশ্বেশ্বরীর মুখের ভাব দেখিতে পাইল না। ডাকিল জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা চকিত হইয়া তাহাব মাথাটা একটুখানি নাড়িয়া দিয়া সাড়া দিলেন।

রমা কহিল, একটা কথা আজ তোমার কাছে স্বীকার করব জ্যাঠাইমা। পিরপুরের জাফর আলির বাড়িতে সন্ধ্যার পর গ্রামের ছেলেরা জড় হয়ে রমেশদা'র কথামত সৎ-আলোচনাই করত; বদমাইশের দল ব'লে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবাব একটা মতলব চলছিল—আমি লোক পাঠিয়ে তাদের সাবধান করে দিয়েছি। কারণ পুলিশ তো এই চায়। একবার তাদের হাতে পেলে তো আব রক্ষা রাখত না।

শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী শিহরিয়া উঠিলেন—বলিস্ কি রে? নিজের গ্রামের মধ্যে পুলিশের এই উৎপাত বেণী মিছে ক'রে ডেকে আনতে চেয়েছিল?

রমা কহিল, আমার মনে হয় বড়দা'র এই শাস্তি তারই ফল। আমাকে মাপ করতে পারবে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া নীরবে রমার ললাট চুম্বন করিলেন। বলিলেন, তোর মা হয়ে এ যদি না আমি মাপ করতে পারি, কে পারবে রমা? আমি আশীর্বাদ করি এর পুরস্কার ভগবান তোমাকে যেন দেন।

রমা হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার এই একটা সান্ত্বনা জ্যাঠাইমা, তিনি ফিরে এসে দেখবেন তাঁর সুখের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। যা তিনি চেয়েছিলেন তাঁর সেই দেশের চাষাভূষোরা এবার ঘুম-ভেঙে উঠে বসেছে। তাঁকে চিনেছে, তাঁকে ভালোবেসেছে। এই ভালোবাসার আনন্দে তিনি আমার অপরাধ কি ভুলতে পারবেন না জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী কথা কহিতে পারিলেন না। শুধু তাঁহার চোখ হইতে এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া রমার কপালের উপর পড়িল। তারপর বহুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

রমা ডাকিল, জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, কেন মা?

রমা কহিল, শুধু একটি জায়গায় আমরা দূরে যেতে পারিনি। তোমাকে আমরা দু'জনেই ভালোবেসেছিলাম।

বিশ্বেশ্বরী আবার নত হইয়া তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

রমা কহিল, সেই জোরে আমি একটি দাবী তোমার কাছে রেখে যাব। আমি যখন আর থাকব না, তখনও আমাকে যদি তিনি ক্ষমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন, তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক বেশি দুঃখ যে আমিও পেয়েছি—তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।

বিশ্বেশ্বরী উপুড় হইয়া পড়িয়া বুক দিয়া রমাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, চল্ না আমরা কোন তীর্থে গিয়ে

থাকি! যেখানে বেণী নেই, রমেশ নেই—যেখানে চোখ তুললেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেইখানেই যাই। আমি সব বুঝতে পেরেছি রমা। যদি যাবার দিন তোর এগিয়ে এসে থাকে মা, তবে এ-বিষ বুকে পুরে জ্বলে-পুড়ে সেখানে গেলে তো চলবে না। আমরা বামুনের মেয়ে, সেখানে যাবার দিনটিতে আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

রমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস আয়ত্ত কবিতে করিতে শুধু কহিল, আমিও তেমনি করেই যেতে চাই জ্যাঠাইমা।

আঠার

কারা-প্রাচীবেব বাহিবে যে তাহাব সমস্ত দুঃখ ভগবান এমন করিয়া সার্থক কবিয়া দিবার আয়োজন কবিয়া রাখিয়াছিলেন বোধকরি উন্মত্ত বিকারেও ইহা রমেশেব আশা করা সম্ভবপর ছিল না। ছয় মাস সশ্রম কারাবাসেব পব মুক্তিলাভ করিয়া সে জেলেব বাহিবে পা দিয়াই দেখিল অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। স্বয়ং বেণী ঘোষাল মাথায় চাদব জড়াইয়া সবাগ্রে দণ্ডায়মান। তাহাব পশ্চাতে উভয় বিদ্যালয়ের মাষ্টাব, পণ্ডিত ও ছাত্রের দল এবং কযেকজন হিন্দু-মুসলমান প্রজা। বেণী সজোবে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় কহিল, রমেশ, ভাই বে, নাড়ীর টান যে এমন টান এবার তা টেব পেয়েছি। যদু মুখুজ্যেব মেয়ে যে আচায্যি হারামজাদাকে হাত ক'রে এমন শত্রুতা কববে, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে আমি তখন জানতে চাইনি, ভগবান তার শাস্তি আমাকে ভালোমতই দিয়েছেন! জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি

ভাল রমেশ, বাইরে এই ছ'টা মাস আমি যে তুষের আগুনে জ্বলে-পুড়ে গেছি।

রমেশ কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল; হেডমাষ্টার পাড়ুই মহাশয় একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া রমেশের পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। তাহার পিছনের দলটি তখন অগ্রসর হইয়া কেহ আশীর্বাদ, কেহ সেলাম, কেহ প্রণাম করিবার ঘটায় সমস্ত পথটা যেন চষিয়া ফেলিতে লাগিল। বেণীর কান্না আর মানা মানিল না। অশ্রু-গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল, দাদার ওপর অভিমান রাখিস্ নে ভাই, বাড়ি চল্, মা কেঁদে কেঁদে দু'চক্ষু অন্ধ করবার যোগাড় করেছেন।

ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল; রমেশ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাতে

চড়িয়া বসিল। বেণী সম্মুখের আসনে স্থান গ্রহণ করিয়া মাথার চাদর খুলিয়া ফেলিল। ঘা শুকাইয়া গেলেও আঘাতের চিহ্ন জাজ্বল্যমান। বেণী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ডান হাত উল্টাইয়া কহিল, কাকে আর দোষ দেব ভাই, আমার নিজের কর্মফল—আমারই পাপের শাস্তি, কিন্তু সে আর শুনে কি হবে? বলিয়া মুখের উপর গভীর বেদনার আভাষ ফুটাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার নিজের মুখের এই সরল স্বীকারোক্তিতে রমেশের চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। সে মনে করিল কিছু একটা হইয়াছেই। তাই সে কথা শুনিবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না। কিন্তু বেণী যে জন্য ভূমিকাটি করিল তাহা ফাঁসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নিজেই মনে মনে ছটফট করিতে লাগিল। মিনিট-দুই নিঃশব্দে কাটার পরে, সে আবার একটা নিঃশ্বাসের দ্বারা রমেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমার এই একটা জন্মগত দোষ যে কিছুতেই মন আর মুখ এক করতে পারি নে। মনের ভাব আর পাঁচজনের মত ঢেকে রাখতে পারিনি ব'লে কত শাস্তিই যে ভোগ করতে হয় তবু আমার চৈতন্য হ'ল না।

রমেশ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বেণী কণ্ঠস্বর আরও মৃদু ও গম্ভীর করিয়া কহিতে লাগিল, আমার দোষের মধ্যে সেদিন মনের কষ্ট আর চাপতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলেছিলাম, রমা, আমরা তোর এমন কি অপরাধ করেছিলাম যে এই সর্বনাশ আমাদের করলি। জেল হয়েছে শুনলে যে মা একেবারে প্রাণ-বিসর্জন করবেন। আমরা ভায়ে ভায়ে বিষয় নিয়ে ঝগড়া করি—যা করি, কিন্তু তবুও তো সে আমার ভাই। তুই একটা আঘাতে আমার ভাইকে মারলি, মাকে মারলি কিন্তু নির্দোষীর ভগবান আছেন, বলিয়া সে গাড়ির বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া আর একবার যেন নালিশ জানাইল।

রমেশ যদিও এ অভিযোগে যোগ দিল না, কিন্তু মন দিয়া

শুনিতে লাগিল। বেণী একটু থামিয়া কহিল, রমেশ, রমার সেই উগ্রমূর্তি মনে হলে এখনো হৃদ্‌কম্প হয়, দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললে, রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যায়নি? পারলে ছেড়ে দিত বুঝি? মেয়েমানুষের এত দর্প সহ্য হ'ল না রমেশ। আমিও রেগে বলে ফেললাম, আচ্ছা ফিরে আসুক সে, তারপরে এর বিচার হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বেণীর কথাগুলো মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। কবে তাহার পিতা রমার পিতাকে জেলে দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা সে জানে না; কিন্তু ঠিক এই কথাটি সে দেশে পা দিয়াই রমার মাসির মুখে শুনিয়াছিল তাহার মনে পড়িল। তখন পরের ঘটনা শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

বেণী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, খুন করা তার অভ্যাস আছে তো। আকবর লেঠেলকে পাঠিয়েছিল মনে নেই? কিন্তু তোমার কাছে তো চালাকি খাটেনি, বরঞ্চ তুমিও উল্‌টে শিখিয়ে দিয়েছিলে; কিন্তু আমাকে দেখেছ তো? এই ক্ষীণজীবী—বলিয়া বেণী একটু-খানি চিন্তা করিয়া লইয়া তুষ্টু কলুর ছেলের কল্পিত বিবরণ নিজের অন্ধকার অন্তরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আপনার ভাষায় ধীরে ধীরে গ্রথিত করিয়া বিবৃত করিল।

রমেশ রুদ্ধনিঃশ্বাসে কহিল, তারপর?

বেণী মলিন-মুখে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তারপরে কি আর মনে আছে ভাই! কে কিসে ক'রে যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কি হ'ল, কে দেখলে কিছুই জানি নে। দশদিন পরে জ্ঞান হয়ে দেখলাম হাসপাতালে পড়ে আছি। এ-যাত্রা যে রক্ষে পেয়েছি সে কেবল মায়ের পুণ্যে—এমন মা কি আর আছে রমেশ!

রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না, কাঠের মূর্তির মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। শুধু কেবল তাহার দশ অঙ্গুলি জড় হইয়া

বজ্র-কঠিন মুঠোয় পরিণত হইল। তাহার মাথায় ক্রোধ ও ঘৃণায় যে ভীষণ বহ্নি জ্বলিতে লাগিল তাহার পরিমাণ করিবার কাহারও সাধ্য রহিল না। বেণী যে কত মন্দ তাহা সে জানিত। তাহার অসাধ্য যে কিছুই নাই ইহাও তাহার অজানা ছিল না; কিন্তু সংসারে কোন মানুষই যে এত অসত্য এমন অসংকোচে এরূপ অনর্গল উচ্চারণ করিয়া যাইতে পারে তাহা কল্পনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। তাই রমার সমস্ত অপরাধই সত্য বলিয়া রমেশ বিশ্বাস করিল।

সে দেশে ফিরিয়া আসায় গ্রামময় যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং রাত্রি পর্যন্ত এত জনসমাগম, এত কথা, এত আত্মীয়তার ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল যে, কারাবাসের যেটুকু গ্লানি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা উবিয়া গেল। শুধু তাই নয়' রমেশের উপর অন্যায় অত্যাচারের জন্য গ্রামের সকলেই মর্মাহত, সেকথা একে একে সবাই তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে। ইহাদের সমবেত সহানুভূতি ভাল করিয়া, বেণীকে স্বপক্ষে পাইয়া, আনন্দ উৎসাহে হৃদয় তাহার বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ছয় মাস পূবে যে সকল কাজ আরম্ভ করিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, আবার পূর্ণোদ্যমে তাহাতে লাগিয়া পড়িবে সংকল্প করিয়া রমেশ কিছুদিনের জন্য নিজেও এই সকল আমোদ-আহ্লাদে গা ঢালিয়া সর্বত্র ছোট-বড় সকল বাড়িতে সকলের কাছে সকল বিষয়ের খোজ-খবর লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। শুধু একটা বিষয় হইতে সে সকল রকমে নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিতেছিল—তা রমার প্রসঙ্গ। সে পীড়িত তাহা পথেই শুনিয়াছিল; কিন্তু সে পীড়া যে এখন কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কোন সংবাদে গ্রহণ করিতে চাহে নাই। তাহার সমস্ত সম্বন্ধ হইতে আপনাকে সে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, ইহাই তাহার ধারণা। গ্রামে আসিয়াই মুখে মুখে শুনিয়াছিল শুধু একা রমাই

যে তাহার সমস্ত দুঃখের মূল তাহা সবাই জানে। সুতরাং এইখানে বেণী যে মিথ্যা কথা কহে নাই তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে বেণী আসিয়া রমেশকে চাপিয়া ধরিল। পিরপুরের একটা বড় বিষয়ের অংশ-বিভাগ লইয়া বহুদিন হইতে রমার সহিত তাহার প্রচ্ছন্ন মনোবিবাদ ছিল, এই সুযোগে সেটা হস্তগত করিয়া লওয়া তাহার উদ্দেশ্য।

বেণী বাহিরে যাহাই বলুক সে মনে মনে রমাকে ভয় করিত। এখন সে শয্যাগত, মামলা-মকদ্দমা করিতে পারিবে না; উপরন্তু তাহাদের মুসলমান প্রজারাও রমেশের কথা ঠেলিতে পারিবে না। পরে যাহাই হোক অপাততঃ বেদখল করিবার এমন অবসর আর মিলিবে না বলিয়া সে একেবারে জিদ ধরিয়া বসিল। রমেশ আশ্চর্য হইয়া অস্বীকার করিতেই বেণী বহু প্রকারে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া শেষে কহিল, হবে না কেন? বাগে পেয়ে সে কবে তোমাকে ছেড়েছে যে তার অসুখের কথা তুমি ভাবতে যাচ্ছ? তোমাকে যখন সে জেলে দিয়েছিল, তখন তোমার অসুখই বা কোন্ কম ছিল ভাই!

কথাটা সত্য। রমেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। তবু কেন যে তাহার মন কিছুতেই তাহার বিপক্ষতা করিতে চাহিল না, বেণীর সহস্র কটু উত্তেজনা সত্ত্বেও রমার অসহায় পীড়িত অবস্থা মনে করিতেই তাহার সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তি সংকুচিত হইয়া অচিরে মিলাইয়া গেল; তাহার সুস্পষ্ট হেতু সে নিজেও খুঁজিয়া পাইল না। রমেশ চুপ করিয়া রহিল। বেণী কাজ হইতেছে জানিলে ধৈর্য ধরিতে জানে। সে তখনকার মত আর পীড়াপীড়ি না করিয়া চলিয়া গেল।

এবার আর একটা জিনিস রমেশের বড় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরীর কোন দিনই সংসারে যে বিশেষ আসক্তি ছিল না তাহা সে পূর্বেও জানিত, কিন্তু এবার ফিরিয়া আসিয়া সেই অনাসক্তিটা যেন বিতৃষ্ণায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহার, মনে হইতেছিল।

কারাগার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বেণীর সঙ্গে যেদিন সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল সেদিন বিশ্বেশ্বরী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সহজ-কণ্ঠে বারংবার অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তথাপি কি যেন একটা তাহাতে ছিল যাহাতে সে ব্যথাই পাইয়াছিল। আজ হঠাৎ কথায় কথায় শুনিল, বিশ্বেশ্বরী কাশীবাস সংকল্প করিয়া যাত্রা করিতেছেন, আর ফিরিবেন না; শুনিয়া সে চমকিয়া গেল। কৈ, সে তো কিছুই জানে না! নানা কাজে পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; কিন্তু যে দিন হইয়াছিল সে দিন তো তিনি কোন কথা বলেন নাই! যদিও সে জানিত, তিনি নিজে হইতে আপনার বা পরের কথা আলোচনা করিতে কোন দিন ভালোবাসেন না, কিন্তু আজিকার সংবাদটার সহিত সে দিনের স্মৃতিটা পাশাপাশি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবামাত্র তাহার এই একান্ত বৈরাগ্যের অর্থ রমেশ দেখিতে পাইল। আর তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না, জ্যাঠাইমা সত্যই বিদায় লইতেছেন। এ যে কি, তাঁহার না থাকার অভাব যে কি, মনে করিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন নটা-দশটা। ঘরে ঢুকিতে গিয়া দাসী জানাইল তিনি মুখুজ্যে-বাড়ি গিয়েছেন।

রমেশ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এমন সময়ে যে?

এই দাসীটি বহুদিনের পুরানো। সে মৃদু হাসিয়া কহিল, মার আবার সময়-অসময়। তাছাড়া আজ তাঁদের ছোটবাবুর পৈতে কি না।

যতীনের উপনয়ন?

রমেশ আরও আশ্চর্য হইয়া কহিল, কৈ এ কথা তো কেউ জানে না!

দাসী কহিল, তাঁরা কাউকে বলেন নি। বললেও তো কেউ গিয়ে খাবে না—রমাদিদিকে কর্তারা সব একঘরে ক'রে রেখেছেন কিনা।

রমেশের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই দাসী সলজ্জে ঘাড়টা ফিরাইয়া বলিল, কি জানি ছোটবাবু—রমাদিদির কি বড় বিশ্রী অখ্যাতি বেরিয়েছে কিনা--আমরা গরীব-দুঃখী মানুষ, সে-সব জানি নে ছোটবাবু! বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমেশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে যে বেণীর ক্রুদ্ধ প্রতিশোধ তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াও সে বুঝিল; কিন্তু ক্রোধ কি জন্য এবং কিসের প্রতিহিংসা কামনা করিয়া সে কোন্ বিশ্রী ধারায় রমার অখ্যাতিকে চলাইয়া দিয়াছে এ সকল ঠিকমত অনুমান করাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

উনিশ

সেই দিন অপরাহ্নে একটা অচিন্ত্যনীয় ঘটনা ঘটিল। আদালতের বিচার উপেক্ষা করিয়া কৈলাস নাপিত এবং সেখ মতিলাল সাক্ষী-সাবুদ সঙ্গে লইয়া রমেশের শরণাপন্ন হইল। রমেশ অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, আমার বিচার তোমরা মানবে কেন বাপু!

বাদী-প্রতিবাদী উভয়েই জবাব দিল, মানব না কেন বাবু, হাকিমের চেয়ে আপনার বিদ্যাবুদ্ধিই কোন্ কম? আর হাকিম হুজুর যা কিছু তা আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকেই তো হয়ে থাকেন! কাল যদি আপনি সরকারী চাকরী নিয়ে হাকিম হয়ে বসে বিচার করে দেন, সেই বিচার তো আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে। তখন তো মানব না বললে চলবে না।

কথা শুনিয়া রমেশের বুক গর্বে আনন্দে ফুলিয়া উঠিল। কৈলাস কহিল, আপনাকে আমরা দু'জনেই দু'কথা বুঝিয়ে বলিতে পারব; কিন্তু আদালতে সেটি হবে না। তা ছাড়া গাঁটের কড়ি

মুঠো ভরে উকিলকে না দিতে পারলে সুবিধে কিছুতেই হয় না বাবু! এখানে একটি পয়সা খরচ নেই, উকিলকে খোশামোদ করতে হবে না, পথ-হাঁটাহাঁটি করে মরতে হবে না। না বাবু, আপনি যা হুকুম করবেন, ভাল হোক মন্দ হোক, আমরা তাতেই রাজি হয়ে আপনার পায়ের ধলো মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে যাব। ভগবান সুবুদ্ধি দিলেন, আমরা দু'জনে তাই আদালত থেকে ফিরে এসে আপনার চরণেই শরণ নিলাম।

একটা ছোট নালা লইয়া উভয়ের বিবাদ। দলিল-পত্র সামান্য যাহা কিছু ছিল রমেশের হাতে দিয়া কাল সকালে আসিবে বলিয়া উভয়ে লোকজন লইযা প্রস্থান করিবার পর রমেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ইহা তাহার কল্পনার অতীত। বাহিরে বসন্ত-জোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া হঠাৎ তাহার রমাকে মনে পড়িল। অন্য কোন দিন হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিত; কিন্তু আজ জ্বালা করা তো দূরের কথা। কোথাও সে একবিন্দু উত্তাপের অস্তিত্বও অনুভব করিল না। মনে, মনে একটু হাসিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমাকে এমন সার্থক করে তুলবেন, তোমার বিষ আমার অদৃষ্টে এমন অমৃত হয়ে উঠবে এ যদি তুমি জানতে রমা, বোধ করি কখনও আমাকে জেলে দিতে চাইতে না!

—কে গা?

আমি রাধা, ছোটবাবু! রমাদিদি অতি অবিশ্যি করে একবার দেখা দিতে বলেছেন।

রমা সাক্ষাৎ করিবার জন্য দাসী পাঠাইয়া দিয়াছে! রমেশ অবাক্ হইয়া রহিল। আজ এ কোন্ নষ্টবুদ্ধি-দেবতা তাহার সহিত সকল প্রকারের অনাসৃষ্টি কৌতুক করিতেছে!

দাসী কহিল, একবার দয়া ক'রে যদি ছোটবাবু—

কোথায় তিনি?

ঘরে শুয়ে আছেন। একটু থামিয়া কহিল, কাল তো আর সময় হয়ে উঠবে না ; তাই এখন যদি একবার—

আচ্ছা চল যাই, বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া রমা একপ্রকার সচকিত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়াছিল। দাসীর কথামত রমেশ ঘরে ঢুকিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিতেই সে কেবল যেন মনের জোরেই নিজেকে টানিয়া আনিয়া রমেশের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। ঘরের এককোণে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই মৃদু আলোকে রমেশ অস্পষ্ট আকারে রমার যতটুকু দেখিতে পাইল তাহাতে তাহার শারীরিক অবস্থার কিছুই জানিতে পারিল না। এইমাত্র আসিতে আসিতে সে যে-রকম সংকল্প মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, রমার সম্মুখে বসিয়া তাহার আগাগোড়াই বেঠিক হইয়া গেল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছ রাণী ?

রমা তাহার পায়ের গোড়া হইতে একটুখান সরিয়া বসিয়া কহিল, আমাকে আপনি রমা বলেই ডাকবেন।

রমেশের পিঠে কে যেন চাবুকেব ঘা মারিল। সে এক মুহূর্তেই কঠিন হইয়া কহিল, বেশ, তাই। শুনেছিলাম তুমি অসুস্থ ছিলে—এখন কেমন আছ তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। নইলে নাম যাই হোক সে ধ'রে ডাকবার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও হবে না।

রমা সমস্ত বুঝিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া ধারে ধীরে কহিল, এখন আমি ভালো আছি।

তারপরে কহিল, আমি ডেকে পাঠিয়েছি ব'লে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য হয়েছেন, কিন্তু—

রমেশ কথার মাঝখানেই তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, না হইনি। তোমার কোনো কাজে আশ্চর্য হবার দিন আমার কেটে গেছে ; কিন্তু ডেকে পাঠিয়েছ কেন ?

কথাটা রমার বুকে যে কত বড় আঘাত করিল তাহা রমেশ জানিতে পারিল না। সে মৌন-নতমুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, রমেশদা, আজ দু'টি কাজের জন্যে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেছি! আমি তোমার কাছে কত অপরাধ যে করেছি সে তো আমি জানি; কিন্তু তবু আমি নিশ্চয় জানতাম তুমি আসবে, আমার এই দু'টি শেষ অনুরোধও অস্বীকাব করবে না।

অশ্রুভারে সহসা তাহার গলাব আওয়াজ ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া গেল। তাহা এতই স্পষ্ট যে রমেশ টেব পাইল এবং চক্ষের নিমিষে তাহার পূর্বস্নেহ জাগিয়া উঠিল। এত আঘাত-প্রতিঘাতেও সে স্নেহ যে আজিও মবে নাই, শুধু নির্জীব অচৈতন্যের মত পড়িয়াছিল মাত্র, তাহা নিশ্চিত অনুভব করিয়া সে নিজেও আজ বিস্মিত হইয়া গেল! ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, কি তোমাব অনুরোধ?

রমা চকিতেব মত মুখ তুলিয়াই আবাব অবনত করিল। কহিল, যে বিষয়টা বডদা তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্ছেন, সেটা আমার নিজেব; অর্থাৎ আমার পনের আনা, তোমাদেব এক আনা; সেইটাই আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।

রমেশ আবার যেন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কহিল, তোমার ভয় নেই, আমি চুরি কবতে পূর্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো করব না। আর যদি দান করতেই চাও—তাব জন্যে লোক আছে—আমি দান গ্রহণ করিনে।

পূর্বে হইলে রমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিত, মুখুজ্যেদের দান গ্রহণ করায় ঘোষালদের অপমান হয় না। আজ কিন্তু এ কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে বিনীতভাবে কহিল, জানি রমেশদা, তুমি চুরি করতে সাহায্য করবে না। আব নিলেও যে তুমি নিজের জন্য নেবে না সেও আমি জানি; কিন্তু তা তো নয়। দোষ করলে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেছি এটা তাবই জরিমানা ব'লে কেন গ্রহণ কর না।

রমেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?

রমা কহিল, আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাকে তোমার মত ক'রে মানুষ ক'রো। বড় হয়ে সে যেন তোমার মতই হাসিমুখে স্বার্থত্যাগ করতে পারে।

রমেশের চিত্তের সমস্ত কঠোরতা বিগলিত হইয়া গেল। রমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, এ আমার চোখে দেখে যাবার সময় হবে না, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যতীনের দেহে তার পূর্বপুরুষের রক্ত আছে। ত্যাগ করবার যে শক্তি তার অস্থি-মজ্জায় মিশিয়ে আছে—শেখালে হয়ত একদিন সে তোমার মতই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পর রমেশ কহিল, দেখ, এ সকলের মধ্যে আর আমাকে টেনো না। আমি অনেক দুঃখ-কষ্টের পর একটুখানি

আলোর শিখা জ্বালতে পেরেছি, তাই আমার কেবল ভয় হয় পাছে একটুতেই তা নিবে যায়।

রমা কহিল, আর ভয় নেই রমেশদা, তোমার এ আলো আর নিববে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূর থেকে এসে বড় উঁচুতে ব'সে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা-বিঘ্ন পেয়েছ। আমরা নিজেদের দুর্গতির ভারে তোমাকে নাবিয়ে এনে এখন ঠিক জায়গাটিতেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি। তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছ বলেই তোমার ভয় হচ্ছে; আগে হলে এ আশঙ্কা তোমার মনেও ঠাঁই পেত না। তখন তুমি গ্রাম্য-সমাজের অতীত ছিলে, আজ তুমি তারই একজন হয়েছ। তাই এ আলো তোমার ম্লান হবে না।—প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সহসা জ্যাঠাইমার নামে রমেশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; কহিল, ঠিক জানো কি রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিবে যাবে না?

রমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, ঠিক জানি। যিনি সব জানেন, এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে, আজ আশীর্বাদ ক'রে আমাকে বিদায় দাও রমেশদা, আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

বজ্র-ভরা মেঘের মত রমেশের বুকের ভিতরটা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। রমা কহিল, আমার একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বল রাখবে?

রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি কথা?

রমা বলিল, আমার কথা নিয়ে বড়দা'র সঙ্গে তুমি কোন দিন ঝগড়া করো না।

রমেশ বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, তার মানে?

রমা কহিল, মানে যদি কখনও শুনতে পাও সেদিন শুধু এই কথাটিই মনে করো, আমি কেমন ক'রে নিঃশব্দে সব সহ্য ক'রে চলে

গেছি—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল সেদিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন, মা, মিথ্যেকে ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রে জাগিয়ে তুললেই তার পরমায়ু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিষ্ণুতায় তার আয়ু বাড়িয়ে তোলার মত পাপ অল্পই আছে; তাঁর এই উপদেশটি মনে রেখে আমি সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্যই কাটিয়ে উঠেছি—ওটি তুমিও কোনদিন ভুলো না রমেশদা।

রমেশ নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমা ক্ষণেক পরে কহিল, আজ আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারছ না মনে ক'রে দুঃখ করো না রমেশদা। আমি নিশ্চয় জানি আজ যা কঠিন ব'লে মনে হচ্ছে, একদিন তাই সোজা হয়ে যাবে। সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা করবে জেনে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্লেশ নেই। কাল আমি যাচ্ছি।

কাল? রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে কাল?

রমা কহিল, জ্যাঠাইমা যেখানে নিয়ে যাবেন, আমি সেইখানেই যাব।

রমেশ কহিল, কিন্তু তিনি তো আর ফিরে আসবেন না শুনছি।

রমা ধীরে ধীরে বলিল, আমিও না। আমিও তোমাদের পায়ে জন্মের মত বিদায় নিচ্ছি।

এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইল। রমেশ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা, যাও; কিন্তু কেন বিদায় চাইছ সেও কি জানতে পারব না?

রমা মৌন হইয়া রহিল। রমেশ পুনরায় কহিল, কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে রেখে চ'লে গেলে সে তুমিই জানো; কিন্তু আমিও কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমাকে সর্বান্তঃকরণেই ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারায় যে আমার কি ব্যথা, সে শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন।

রমার দুই চোখ বহিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু সেই অত্যন্ত মৃদু আলোকে রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। রমা নিঃশব্দে দূর হইতে তাহাকে আর একবার প্রণাম করিল, এবং পরক্ষণেই রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার সমস্ত কাজকর্মের উৎসাহ যেন এক নিমিষে এই জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট ছায়াময় হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলায় রমেশ এ বাড়িতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বিশ্বেশ্বরী যাত্রা করিয়া পাল্কিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রমেশ দ্বারের কাছে মুখ লইয়া অশ্রু-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ ক'রে চললে, জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী ডান হাত বাড়াইয়া রমেশের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, অপরাধের কথা বলতে গেলে তো শেষ হবে না বাবা! তাতে কাজ নেই। তারপরে বলিলেন, এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হলে তো কোনমতেই মুক্তি পাব না। ইহকালটা তো জ্বলে-জ্বলেই গেল বাবা, পাছে পরকালটায় এমনি জ্বলে-পুড়ে মরি আমি সেই ভয়ে পালাচ্ছি রমেশ।

রমেশ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। আজ এই একটি কথায় সে জ্যাঠাইমার বুকের ভিতরটার জননীর জ্বালা যেমন করিয়া দেখিতে পাইল, এমন আর কোন দিন পায় নাই। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া রমেশ কহিল, রমা কেন যাচ্ছে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী একটা প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন সংবরণ করিয়া লইলেন। তারপরে গলা খাটো করিয়া বলিলেন, সংসারে তারও যে স্থান নেই বাবা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্ছি; সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানি নে, কিন্তু যদি বাঁচে সারাজীবন ধ'রে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ

দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন! এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা! ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই, বলিতে বলিতেই তাঁর গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাকে এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই।

রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; বিশ্বেশ্বরী একটু পরেই কহিলেন, কিন্তু তোর ওপর আমার এই আদেশ রইল রমেশ, তাকে তুই যেন ভুল বুঝিস্ নে। যাবার সময় আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ ক'রে যেতে চাই নে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনও অবিশ্বাস করিস্ নে যে, তার চেয়ে বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তোর আর কেউ নেই।

রমেশ বলিতে গেল, কিন্তু জ্যাঠাইমা—

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই রমেশ। তুই যা শুনেছিস্ সব মিথ্যে; যা জেনেছিস্ সব ভুল; কিন্তু এ অভিযোগের এখানেই যেন সমাপ্তি হয়। তোর কাজ যেন সমস্ত অন্যায়, সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ ক'রে চিরদিন এমনি প্রবল হয়ে ব'য়ে যেতে পারে—এই তোর ওপর শেষ অনুরোধ। এই জন্যই সে মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। প্রাণ দিতে বসেছে রে রমেশ, তবু কথা কয়নি।

গত রাত্রে রমার নিজের মুখের দুই-একটা কথাও রমেশের সেই মুহূর্তে মনে পড়িয়া দুর্জয় রোদনের বেগ যেন ঠোঁট পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণ-শক্তিতে বলিয়া ফেলিল, তাকে ব'লো জ্যাঠাইমা তাই হবে, বলিয়াই হাত বাড়াইয়া কোনমতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।